B4312 Stofo Signer

*दशस्त्रीस्*त्र

বে**গুলে** পাবলিক্ষার্জ কলিকাতা-১২



RR ₩3.880 ** / ※

প্রথম সংস্করণ—আবাঢ় :৩৫৬
বিতীর সংস্করণ—বৈশাথ, ১৩৬২
প্রকাশক—শচীক্রনাথ মুখোগাখ্যার
বেলল পাবলিশার্স
১৪, বহিম চাটুক্সে ব্লীট
কলিকাতা:-১২
মুত্রাকর—শ্রীকার্তিকচক্র পাণ্ডা
মুক্রণী
৭১, কৈলাস বোস ব্লীট
কলিকাতা:-৬
প্রচ্ছেপণট শিল্পী
ভাকি বন্দ্যোগাখ্যার

タリンと STATE CENTRAL LIBRARY WEST BENGAL CALCUTTA.

ছ' টাকা

त्रक ७ बाक्सभावे मूखन

ভারত কোটোটাইপ টুডিও বাধাই—বেকল ৰাইখাদ

উৎসর্গ কম**লবাসিনীর স্মরণে**

বাতায়ৰে

রান্তার ধারেই পড়বার ঘর। সেই ঘরের রান্তার দিকের ছুটো জানালা খুলে আমরা ছুই ভাই বসে আছি —পথের দিকে চোধ ও মন খুলে। একটু আগেই শিশি-বোতল-বিক্রিওয়ালার কাছে এক সের স্টেটস্ম্যান পত্রিকা ছ-আনায় বেচে ছ-পয়্নসায় ছ-টা কালো-জাম কিনে এক-এক জন তিনটে ক'রে থেয়ে দেহ ও মন পরিত্প্ত। এ কালো-জাম গাছে ফলে না, ফলে ময়রার দোকানে—এক রকম ছানার পাত্তরা-গোছের জিনিষ। পাত্তরাকে একটু বেশী ভেজে ওপরটা কালো ক'রে রসে চোবানো হয় —আজকাল সে জব্যটির আর দেখা পাওয়া যায় না।

বাকি ছ-টো পয়সা হাতে নিয়ে বসে আছি — লক্ষ্সওয়ালাকে দিতে হবে, তার কাছে ধার ক'রে লক্ষ্স থাওয়া হয়েছে। ধারের কথা জানতে পারলে বাড়ীতে একেবারে জ্যাস্ত পুঁতে ফেলবে।

রান্তার ধারে বসে আছি—গ্রীমের তুপুর বাঁা-বাঁ। করছে। বাড়ীতে গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম চুকে গেছে। মা-রা সব ঘরে গিয়ে শুয়েছেন। তুপুর বেলা একটু শব্দ কোথাও হবার জো নেই—রাতে ঘুম হোক্ বা না হোক, দিনে ঘুমের ব্যাঘাত হ'লে অনর্থ হবে। আমাদের চলা-কেরা, অকার্য ও কার্যালাপে একটু শব্দ হ'লেই তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত হয় অবচ পার্যে শায়িত শিশুর চীৎকারে পাড়ার লোক বিরক্ত হ'য়ে গাল পাড়তে থাকে তবুও তাঁদের নিজা ভাঙে না।

আমাদের অপরাধে ঘুম ছুটে বাওয়ার সলে-সলে তাঁরা ইন্থলের কর্তৃপক্ষকে অভিসম্পাত দিতে থাকেন—গর্মির ছুটির জন্ত। বোধ হয় তার ফলেই ইন্থল-মাষ্টারদের হৃঃখ-ছর্দশা আত্মও ঘুচলো না। রান্তার দিকে চেয়ে বলে আছি ছই ভাইরে— ঐ অনাথের মা বৃড়ী স্নান ক'রে ভিজে-কাপড়ে চলে বাছে। অনাথের মাকে পাড়ার ছেলে-বুড়ো সবাই চেনে। এ-পাড়ার প্রায় সব বাড়ীতেই সে কাজ করেছে, প্রায় পঞ্চাশ বছর এ-পাড়াতেই তার কাটল। কোমর ভেঙে গিয়েছে তবুও আজও তাকে থেটে থেতে হছে। তার বাড়ী সেই গড়পারের কোন বন্তীর মধ্যে। এখন গিয়ে সে রান্না-বান্না ক'রে থাবে, তার পরে আবার বেলা চারটে বাজতে না বাজতে কাজে এসে লাগতে হবে। আবার রাত্রি আটটা-নটার বাড়ীতে গিয়ে রান্না ক'রে থেয়ে-দেয়ে শোবে। অনাথের মা বলে সবাই তাকে ভাকে বটে, কিন্তু অনাথ তার ছেলে নয়—তার এক বোন-পোকে সে মাহুর করেছিল, তার নাম ছিল অনাথ। সে-ও মরে গেছে শৈলবে, পঞ্চাশ বছর আগে, কিন্তু আজও লোকে তাকে অনাথের মা বলে ভাকে।

আনাথের মা কিছুদিন আমাদের বাড়ীতেও কাজ করেছিল, কিন্তু কাজের ঠেলার পালাতে পথ পারনি। সে সমরে অনাথের অনেক গর সে আমাদের কাছে বল্ত। কেমন স্থলর দেখতে ছিল সে, সে তাকে মা বলে ভাক্ত—সেই ডাক এখনো তার কানে লেগে রয়েছে। এক দিন রাতে তার অর হরেছিল—রাত তৃপুরে অনাথ তার গারে হাত দিয়ে বলেছিল—মা, তোর অর হয়েছে।

অনাথ সম্বন্ধে এই গন্ধটি অনেকবার সে আমাদের কাছে করেছে আর প্রতিবারেই তার চকু সজল হয়েছে, গলাধরে গিয়েছে। পঞ্চাশ বছর আগে মরে-যাওরা অচেনা অনাথের হৃংথে আমাদেরও কঠরোধ হয়েছে, আমাদের গল্পের আসর ভেঙে গিয়েছে।

জনাথের মা চলে গেল। বসে আছি লঞ্চ্পওয়ালার জাশায়।

ছ-পরসা শোৰ দিরে জাবার ছ-পরসার লঞ্চ্প থাব—ঐ যায়
রিপুকর্মাওয়ালা—রোগা, একেবারে হাড়গোড় বার করা, মুরে পড়া।

স্থরে গেঁডিরে-গেঁডিরে চলে যার রি-পু-কম-মও, দূর থেকে ওনতে সাগে বেন—কি-কু-ম্-মও।

দূরে গণির মোড়ে সঙ্গুসওয়ালার পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল —ল্যাওনচুস্—ল্যাঞ্স—

তড়াক্ ক'রে বেরিরে গিয়ে রকে দাড়ান গেল। লজ্ড্সওয়ালা কাছে
আসতেই ইসারায় ভাকে ডেকে আমরা ভেতরে ঢুকে গেল্ম। আমাদের
বিপ্রাহরিক গৃহবিধির সদে তার পরিচয় ছিল। সে বাড়ীর সামনে এসে
হাঁক-ডাক থামিয়ে কিছুক্রণ এদিক্-ওদিক্ দেখে টপ্ ক'রে বাড়ীর মধ্যে
ঢুকে সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে পা টিপে-টিপে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকত,
আমরা দরজাটা বন্ধ ক'রে দিতুম। এত সাবধানতার কারণ এই বে,
কোনো রকম শন্দ হোলে ওপরওয়ালাদের মুম ভেঙে বাবে—বার কলে
আমাদের নানান অস্থবিধা, এমন কি বিপদ-আপদ ঘটবার সন্তাবনাও
ছিল। ঘরের মধ্যে নিশ্চিম্ভ হ'য়ে বসে দেনা-পাওনার কথা হোতো, তার
পরে লজঞ্স থেতে-থেতে গল্প চল্ত। বলা বাহল্য, এক ভাগ লজঞ্স
তারও প্রাপ্য ছিল। সব দিনই তাকে ভেতরে আনবার স্থবিধা হোতো
না, মধ্যে-মধ্যে রান্ডা থেকেই তাকে বিদেয় দিতে হোতো।

এই লজ্ঞ্সওয়ালা ছিল আমাদের বন্ধ। আমাদের মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক ব্যবধান ছিল বটে, কিন্তু এই মিলনের দৌত্য করেছিল আমাদের কৈশোর আর তার দিকে ছিল প্রাঠণশ্বর।

সে ছিল মুসলমান। বিহারের কোন এক জেলার তাদের বাড়ী ছিল, কিছ দেশের সলে কোনো সম্বর্ধই নেই—অনেক দিন থেকে তারা ব্যারাকপরে বাস করছে। তার আগনার জন বলতে কেউ নেই। তার বড় বোনের স্বামী ব্যারাকপুরের কাছে কোন এক কলে কুলীগিরি করে, গেই প্রেই ওধানে বাস! বড় বোনও বেঁচে নেই, ভগিনীপতি আবার বিরে করেছে, এ বৌরের ছেলেপুলেও হারছে। এধানেই সে বাকে,

কারণ, তাদের ওপরে মারা পড়ে গিরেছে, ছাড়তে পারে না। বছরের মধ্যে করেক মাস সে-ও কলে কান্ধ করে। বাকী করেক মাস লঞ্চ্ন বিক্রি করে কলকাতার। রোক্ষ বেলা নটা-দশটার সময়ে ট্রেণ চড়ে আসে এখানে, আর রাতের ট্রেণে ফিরে যার। রামবাগানে কোথায় দিশি লঞ্জুসের কারখানা কাছে, সেখান থেকে পাইকারী দরে মাল খরিদ করে।

তার নাম ছিল মৃথিয়া। মৃথিয়া মানে সর্দার। কিন্তু কোনো দেশের
মহন্য জাতি অথবা সম্প্রদায়ের সর্দার হবার মতন গুণ বা চেহারা তার ছিল
না। অবিশ্রি এ জন্ম তাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না! মাহুষের নাম
অতি অল্প ক্ষেত্রেই গুণবাচক হ'য়ে থাকে। দেখা যায় বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে
নামের গুণাবলীর সঙ্গে মাহুষের অহি-নকুল সম্পর্ক দাড়াতে থাকে।
নামকরণ সংস্কারটি মাহুষের মৃত্যুর পরই হওয়া উচিত।

আমরা তথন বালক হ'লেও মুথিয়ার চাইতে মাথয়া উচ্ ছিলুম।
বামনের মতন মুথথানা অস্বাভাবিক রকমের বড় হ'লেও তাকে ঠিক বামন
বলা চলত না। তার রং ছিল কালো। কিন্তু বাপ রে, সে কি কালো!
ডান দিকের মাধার মাঝখান থেকে আরম্ভ ক'রে একেবারে চিবুক অবধি
পোড়া। এতথানি জায়গা একেবারে মস্থাও চকচকে এবং তার মাঝে
মাঝে সালা দাগ, ধবলের মতন—অমাবস্থার অন্ধকার আকাশে যেন তারা
ঝক্ ঝক্ করছে। পুড়ে যাওয়ার ফলে ডান চোথের কোণটা যেন টেনে
ধরা হয়েছে গোছের, আর চোথের তলার দিকের লাল্টা বেরিয়ে এগেছে
—বেন দগ্দগে ঘা। ডান দিকে মাথায় চুল, ভূক, গোঁফ কিংবা দাড়ি
এক গাছিও নেই। বা দিকের মাথায় চুল এবং ভূক আছে বটে, কিছ
দাড়ি এথানে ছটি ওথানে চারটি—গোঁফও সেই রকম। এক দিক্কার
দাড়ি-গোঁফ টেচে কেলে তাকে ভক্র হ'তে বললেই সে তার সেই কয়েক
গাছা দাড়িতে হাত বুলোতে-বুলোতে বলত—ওরে বাবা, তা হয় না—আমি

নেমাজী লোক, দাড়ি ফেলতে পারি কখনো? বরস ছিল তার ত্রিশের ওপর। একবার করনা করুন সেই চেহারাখানা!

কিছ সেই কুৎসিতের মধ্যে বাস করত একটি স্থন্দর প্রাণ।

মুখিরা মাসে প্রায় পনেরে।-যোলো টাকা রোজগার করত, কিন্ত তা থেকে নিজের সন্তোগের জন্ত একটি পরসাও ধরচ করত না, সব ভগিনী-পতির হাতে ভূলে দিত। সে বলত—ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েগুলোকে বড় ভালবাসি, তাই তাদের ছেড়ে অন্ত কোথাও যেতে পারি না। নইলে এত বড় ছনিয়ার কি থাকবার জায়গার অভাব আছে ?

অথচ তারা তার নিজের বোনের ছেলেপিলে নয়। তার ভগিনীপতির বিতীয়া স্ত্রীও তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত না। সে মৃথিয়াকে 'পোড়ারমুখো' বলে ডাক্ত।

আমরা বলতুম—তুই কিছু বলতে পারিদ্ না ?

মুথিয়া বলত—কি আর বলব! সত্যিই তো আমার মুখ পোড়া। এই সবের জক্ত তাকে আমাদের বড় ভাল লাগত ও পরে সেই আকর্ষণ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল।

তার সঙ্গে কেমন ক'রে বিচ্ছেদ হোলো সেই কাহিনীটাই বলি।

আমাদের সেই বিপ্রাহরিক আড্ডাটা সেবাব গরমের ছুটির সময়
খ্বই জমে উঠেছিল। মুখিয়া ছাড়াও লজকুদের লোভে-লোভে পাড়ার
আরও ছটি-তিনটি ছেলে এনে রোক্ত জমতে লাগল সেখানে। বাড়ীর
কেউ জানে না, খুবই সন্তর্পণে আড্ডাধারীরা বাওয়া-আসা করে। আমরা
ছই ভাই বাড়ীর মধ্যে উচ্চহাসির জক্ত কুখ্যাত ছিলুম, কিন্তু আড্ডা ধরা
পড়বার ভয়ে সে সময়টা আমরা প্রাণপণে হাসি সামলে রাখতুম।
একটি ছেলে ছিল, সে ভারি মজার-মজার সব গল্প ও কাহিনী
বলতে পারত। সেই বয়সেই গল্প বলবার বেশ একটা চাল সে
আয়ত্ত করেছিল।

শবে-যাবে ভার গন্ধ ভনে হাসি সামলাভে না পেরে আমরা মুখে কাপড় ঠেসে ছুটে রাভায় বেরিয়ে গিয়ে প্রাণ খুলে হেসে আসভুম। কিছ আশুর্বের বিষয় যে, সে নিজে একটুও হাসত না বরং আমাদের মুখের দিকে এমন জিজ্ঞাস্থ ভাবে চাইত যে মনে হোতো সে বলতে চায়—কি রে হাস্চিস কেন—এতে হাসবার কি আছে রে ?

মৃথিরা ভাঙা-ভাঙা বাংলা জানত বটে, কিন্তু সব কথার স্ক্র ব্যঞ্জনা সে সব সময়ে ধরতে পারত না—আমাদের হাসতে দেখে সে হাস্রার চেষ্টা করত মাত্র।

সেদিন সেই ছেলেটি একটা মন্তার গল্প বেশ জমিয়ে বলছিল, এমন সময় গল্পের মাঝখানেই হঠাৎ মুখিয়া তারস্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্ল—
ঠিক বাচা গাখার মতন।

হঠাৎ তার সেই চীৎকার শুনে আমরা তো ভড়কেই গেলুম কিন্ত একটু পরেই টের পাওয়া গেল যে সেটা তার হাসি।

হাসি আর থামে না। আমরা যত বলি, এই মুথিয়া, চুপ কর—চুপ কর ভাই, মা উঠে পড়বেন—

আর চুপ কর! একটা দম-দেওয়া কলের মতন মুথিয়া সেই ভাবে গাধার ডাক ছেড়ে চল্ল। হাসির সময় তার মুথের চেহারা হ'য়ে উঠল একেবারে বীভৎস। তার মুথের সেই পোড়া দিক্টা কিরকম কুঁকড়ে গিয়ে বেরিয়ে-পড়া চোথটা যেন আরও ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগল।

কিছুতেই তাকে থামাতে পারি না। ওদিকে মার ঘরের দরজা খুল্ল, তাকে তাজাতে চেষ্টা করতে লাগল্ম কিন্তু কে কার কথা শোনে! হাসির ধমকে সে-সব কথা সে ব্যতেই পারলে না। ইতিমধ্যে মা এসে আমাদের দরজা খুলে দাঁড়াতেই মুখিরার হাসি গেল থেমে। হাসি থাম্ল বটে কিন্তু তার মুখখানার অবস্থা সেই রকমই বেঁকে-চুরে তুব্ডে রইল।

মা বোধ হর প্রথমে মুখিরাকে দেখতে পাননি। বরে চুকে সেদিকে চোখ পড়তেই তাকে দেখে চম্কে—এটা কে রে! বলে এক পা পিছিয়ে গেলেন।

মুথিয়া ততক্ষণে তার লক্ষ্পুসের ডালাটা সামলে নিয়ে মাকে ছোট একটা সেলাম ক'রে সরে পড়ল—তার পেছনে-পেছনে পাড়ার অক্ত ছটি ছেলেও সরে পড়ল। হালামার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্ম আমরাও তথনকার মতন চিলের-ছাতে উঠে আত্মগোপন করলুম।

বাবা আপিস থেকে ফেরবার পর বিকেলে একটা খোলা বারান্দার
মাছর পেতে রোক্তই আমাদের এক পারিবারিক বৈঠক বস্ত। বাড়ীতে
করেকজন মহিলা থাকতেন, তাঁরা আমাদের সংসারেরই লোক হ'রে
গিরেছিলেন। তাঁদের মুখের ওপরে চোপরা, অথবা প্রকাশ্যে তাঁদের
সখকে কোনো রকম অসমানকর মন্তব্য করলে আমাদের কঠিন শান্তি
ভোগ করতে হোতো। প্রাত্যহিক এই পারিবারিক সভায় তাঁরাও
উপস্থিত থাকতেন। এইখানে প্রতিদিনই—বাবা আপিসে চলে যাবার
পর এতক্ষণ পর্যন্ত—অর্থাৎ যতক্ষণ আমরা তাঁর চোখের আড়ালে ছিলুম
—আমরা কি করেছি, অর্থাৎ কেমন ভাবে দিন কাটিয়েছি, তার একটা
ফিরিন্ডি পেশ করতে হোতো। বলা বাছল্য, রোজই বলতুম, এগারোটা
থেকে চারটে অর্থা লেখাপড়া করেছি—প্রমাণ-স্কর্মণ, হাতের লেখা,
আরু ক্যা প্রভৃতি তিনি রোজই নিরম মত দেখে তাতে সই
ক'রে দিতেন।

সেদিন আসরে ডাকের ধরণ দেখেই ব্বতে পারল্ম, আৰু বরাতে কিছু দক্ষিণা আছে।

আসরে উপস্থিত হতেই বাবা গন্তীরশহরে বললেন—বোসো।
একটু নিরাপদ ব্যবধানেই শুটি-স্থাট হয়ে বসে পড়া গেল।
সঙ্গে-সঙ্গে সেই সনাতন প্রশ্ন—আত্ত ছপুরে কি কি করলে?

বদিও জানভূম যে, আব্দ তুপুরের কাহিনী বেশ পল্লবিত হ'রেই তার কানে পৌছেচে তবুও বুক ঠুকে সেই সনাতন উত্তরই দিরে বলসুম— এগারোটা থেকে পৌনে বারটা অবধি অন্ধ ক্ষেচি, পৌনে বারোটা থেকে পৌনে একটা অবধি ভূগোল পড়েছি, পৌনে একটা থেকে একটা অবধি ম্যাপ দেখেছি—

আর বেশী অগ্রসর হবার আগেই একটি মহিলা বলে উঠলেন—ম্যাপ দেখেছ না ছাই দেখেছ!

তারপরে বাবার দিকে চেয়ে তিনি বলতে লাগলেন—সারাদিন থালি হল্লোড়, হাসি, আড্ডা, গল্প এই তো চলে দেখছি, পড়ে কখন তা তো জানি না।

সব্দে সব্দে আর এক জন স্থক্ক করলেন—ছপুর বেলা ওদের অত্যাচারে চোথের পাতাটি বোজবার যো আছে! হৈ হৈ চলেইছে!

স্থার এক জন মন্তব্য করলেন—এই বয়সে এত বন্ধুই বা এদের জোটে কি ক'রে তাই ভাবি। রাজ্যের লোকের সঙ্গে গলাগলি!

এবারে মা বললেন—আর সে সব বন্ধুর চেহারাই বা কি!

বাবা বললেন — সারা দিন হি হি হি হি স্থার হো হো হো হা ক'রে ক'রে নিজেদের যে রকম চেহারা হয়েছে, বন্ধু-বান্ধবও তো জুটবে সেই মেক্দারের—

বা হোক্, সেদিনকার সভার ঠিক হ'রে গেল হে তুপুর বেলা আমাদের সায়েন্তা রাথবার এক জন জবরদন্ত শিক্ষক রাখা হবে, আর সকাল-সন্ধ্যের জস্তু বাবা তো আছেনই। তাঁর সন্ধানে এমন লোক আছে এ-কথা তিনি সভাক্ষেত্রে প্রকাশ করলেন।

পরের দিন তুপুর বেলার আড্ডায় হঃসংবাদটি প্রকাশ করা গেল।
মুখিয়াকে বললুম—বাড়ীর সামনে দাড়িয়ে হ্-বার 'ল্যাবেঞ্স্' বলে
হাঁক দিলেই আমরা বেরিয়ে আসব।

দিন ছই বাদে আমরা ছপুরের মাষ্টার মশাইকে দেখলুম। আফিস থেকে ফেরবার সময় বাবা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এলেন; বেশ চেহারা ও দিব্যি ভদ্র অমায়িক ভাব। আমাদের ছই ভাইয়ের গাল টিপে-টিপে আদর ক'রে বললেন—এরা তো বেশ ছেলে! আপনি যে রকম বললেন দেখে তো তা মনে হয় না।

বাবা একটু হেসে বললেন—এক একটি বর্ণচোরা। ছ-দিনেই পরিচয় পাবেন।

ঠিক হ'রে গেল কাল তুপুর থেকেই তিনি আমাদের গুরুভার গ্রহণ করবেন।

সেদিন রাত্রিবেলা আমাদের পড়াতে-পড়াতে বাবা বললেন—আমি মাষ্টার মশাইকে বলে দিয়েছি, তোমাদের মেরে কেললেও আমি তাঁকে কিছু বলব না, অতএব সাবধান হয়ে চোলো।

প্রাণধারণের উপকরণগুলির তুর্মূল্যতার সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণ জিনিষটি আজকাল যে রকম স্থলভ হ'য়ে উঠেছে সে মৃগে তা ছিল না, কাজেই অত্মরক্ষার তাগাদায় সাবধান হবারই সংক্রম করতে লাগল্ম মনে-মনে।

ছুটির সময় তৃপুর বেলা এই রকম সাব্দার ব্যবস্থা হওয়ার আমরা বাড়ীশুদ্ধ সবার ওপরে হাড়ে চটে গেলুম; আমরা যে রকম সন্তর্পণে কথা বলতুম, চলতুম এবং যে রকম সাবধানতার সঙ্গে দরক্ষা থোলা ও বন্ধ করা হোতো তাতে কান্ধরই কথনো ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া উচিত নয়। অবস্থি এক দিন মুখিয়া তার অভূত হাসি হেসে স্বাইকে চম্কে দিয়েছিল স্থীকার করি। অভূত রসে চমক লেগেই থাকে—সেটা তাঁরা সহজেই উপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তা না ক'রে বাড়ীশুদ্ধ সকলেই একবাক্যে রায় দিলেন যে, তুপুর বেলা আমাদের অত্যাচারে কোনো দিনই তাঁরা মুমুতে পারেন না!

কি ক'রে তাঁদের সেই আরামের বিপ্রাহরিক স্থবপ্রটির ব্যাঘাত জন্মাতে পারা যায়, তারই পরামর্শ আঁটিতে লাগলুম ছই ভাইরে।

পরের দিন ত্পুর বেলা এগারোটা বাজতে না বাজতে মাষ্টার মশায় এসে হাজির হলেন। এগারোটা থেকে চারটে অবধি কবে কথন কি পড়া বা লেখা হবে প্রথমেই তার একটা রুটিন তৈরী হোলো, তার পরে আসল পড়া স্কর্ক হোলো।

পড়তে লাগলুম মনে মনে। কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থেকে মাষ্টার মশার বললেন—চেঁচিয়ে পড়, তা না হোলে আমি বুঝা কি ক'রে যে তোমরা পড়ছ না ফাঁকি দিছে। চেঁচিয়ে পড়ার আর একটা মস্ত স্থবিধা এই যে, বা পড়বে সঙ্গে-সঙ্গে মুধস্থ হয়ে যাবে।

বাস্! আর বলতে হোলো না, সঙ্গে-সঙ্গে হদিশ লেগে গেল। সেই থেকে স্থক্ক ক'রে বেলা চারটে অবধি আমরা এমন চেঁচিয়ে পড়লুম যে বাড়ীশুদ্ধ লোকের ঘুম তো দূরের কথা, ডাকাত পড়েছে মনে ক'রে কুকুর-গুলো পর্যস্ত ঘেউ-ঘেউ ক'রে ওপর-নীচ করতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

যথাসময় মাষ্টার মশায় চলে গেলেন। তাঁর মুখ দেখে বেশ ব্রুতে পারা গেল যে, আমাদের পড়া মুখন্থ করার আগ্রহটা তিনি ভালো ভাবে গ্রহণ করেন-নি।

বাড়ীর মধ্যে চুকে দেখলুম, সবারই মুখ বেশ গন্তীর—বৃঝলুম ওষ্ধ লেগেছে।

দিন কতক এই রকম চলল—কিন্তু কাঁহাতক রোজ পাঁচ ঘণ্টা ক'রে চেঁচানো বার, চেঁচিরে-চেঁচিয়ে পেটে ও কোঁকে ব্যথা ধরে গেল। তার ওপরে, দিনে ঘুমোনো বাদের অভ্যেস, তারা ইঞ্জিন তৈরির কারথানার পড়েও দিব্যি ঘুম লাগাতে পারে, ত্-এক দিন একটু কষ্ট হয় মাত্র।

वांज़ीरक मिन करत्रक मिश्चि (थएँ हिन । उत्त्व विनिजी-माँहै, वांनि, कृ हेजांनि वांज़ीत এक कांत्रशांत्र यक क'रत् त्त्रत्थ (मध्या रात्रहिनः

ভবিশ্বতের জন্ত । এর কাছেই মিল্লিদের ছোট-বড় কর্ণিক ইত্যাদি সব জড় করা ছিল। মিল্লিদের কাজ ও সরঞ্জাম দেখতে-দেখতে আমাদের স্থপতি-প্রত্তিভা মাধা-চাড়া দিলেন—ঠিক করা গেল, একটি ছোট বাড়ী তৈরি করতে হবে।

ক'দিন ধরে ছোট-বড় দেশলাইরের মধ্যে এঁটেল মাটি পুরে সেগুলোকে রোদে শুকিরে একরাশ ইট ও টালি ভৈরি করা হোলো। এক দিন রাত্রে আমাদের শোবার ঘরের এক কোণে মেন্দ্রে খুঁড়ে বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করা গেল। সকাল বেলা বাড়ীর চারিদিকে লোক-জন চলাফেরা ইত্যাদি নানা ব্যাঘাতে কাজ তেমন অগ্রসর হোলো না। ঠিক হোলো, তুপুর বেলা পড়বার সময় এক-একবার এক এক জন ক'রে উঠে এসে কাজ করা বাবে।

যথা সময়ে মাষ্টার মশায় এলেন। ওপরওয়ালীরা সব শরনমন্দিরে প্রবেশ করবার পর আমি উঠে গিয়ে আধ-ঘণ্টাটাক কাজ ক'রে ফিরে এলুম। ভারা উঠে গেল ভার পর, সে ফিরল প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে। এই রকম ক'রে হজনে বার ছ-ভিন গিয়ে কাজ করা গেল। মনে হোলো এই রেটে কাজ চালাতে পারলে পরের দিনেই একতলার কাজটা শেষ হ'য়ে যেতে পারে।

কিন্ত হার রে পরের দিন! সেদিনটার তিথি-নক্ষত্রের বে কি সমাবেশ চিল তা আত্মও ভাবি।

সেদিন মাষ্টার মশার এসে বসতে না বসতে আমি উঠে গেল্ম, কারণ সিমেণ্টটা মাথা হয়েছিল, দেরী হোলে আবার শুকিরে বাবে। প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে একথানা বই হাতে নিয়ে ফিয়ে এল্ম—অর্থাৎ মাষ্টার মশার যেন মনে করেন বই খুঁজতে দেরী হয়েছে। আমি কিছুক্ষণ্ বসতে না বসতে ভাষা উঠে গেল ও প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে এসে ওটি-ওটি নিজের ভাষগার বসতে বাচ্ছে, এমন সময় মাষ্টার মশার টেচিয়ে উঠলেন, ইংরেজীতে—You boy. come here.

ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত যে আমরা ভড়কে গেলুম। মাষ্টার মশার আমাকেও ডাক ছাড়লেন ইংরেজীতে, ঐ স্থরেই।

আমরা ত্-জনে তাঁর কাছে গিরে পাশাপাশি দাঁড়ালুম। তিনি বললেন

—কাল থেকে দেখছি পড়তে-পড়তে উঠে যাছ্ছ—কোথার যাও—এঁ্যা—

এই বলে, আমাদের উত্তরের জন্ম আর অপেক্ষা না ক'রেই ত্-জনের

মাথার টাই-টাই ক'রে ক্রেকটি শ্রীগাঁটা জমিরে দিলেন।

উ:, মাথা একেবারে চিড্বিড়িয়ে গেল। যে কখনো মারে না তার হাতের আঘাতে লাগে বেশী, কারণ দেহ ও দেহাতীত ত্-লায়গাতে লাগে সে আঘাত।

যা হোক, মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে তো নিজের জায়গায় এসে বসলুম। মাষ্টাব মশায়ের রাগ তথনো পড়েনি। তিনি গর্জে-গর্জে বলতে লাগলেন—চারটের আগে এখান থেকে এক-পা নড়েছ কি দেখবে মজা।

ভারতবর্ষের মানচিত্রধানা সামনে থোলা পড়েছিল। মাথার বন্ধণায় মনে হ'তে লাগ্নল সমস্ত ভারতবর্ষের বুক জুড়ে সর্বের ক্ষেত ভরে উঠেছে।

মাষ্টার মণায় আবার গর্জে উঠলেন—তোমাদের বাবা বে তোমাদের বর্ণচোরা' নাম দিয়েচেন তা ঠিকই দিয়েচেন। বিচক্ষণ ব্যক্তি তিনি।

নামকরণ করার ব্যাপারে বাবার প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদেরও কোনো সন্দেহ ছিল না, কারণ আমাদের নামের জোড়া সেদিন জগতে তুর্লভ ছিল, আজও স্থলভ নয়। তাই সেদিক্ দিয়ে না গিয়ে ভাবতে লাগল্ম, পৃথিবীর আনেক লোকই বর্ণচোরা—বেমন আপনি একটি।

নানা রকম আবোল-তাবোল চিস্তা পাক থাচ্ছে মগজের মধ্যে, এমন সময় গলির মোড়ে আওয়জে হোলো—ল্যা—বেন – চুওওস্—

মুখিরার কাছে এক পরসা ত্-পরসা ক'রে সেবার প্রার চার আনা ধার হ'রে গিয়েছিল। ক'দিন থেকে পরসার জক্ত তাগাদা করায় সেদিন তাকে নিশ্চর দিয়ে দেখার কথা ছিল—পরসার জোগাড়ও হ'রে গিয়েছিল, কিছ কি ক'রে উঠে গিরে তাকে পরসা দেওরা যার! ওদিকে মুখিরা হাঁকতে-হাঁকতে বাড়ীর সামনে এসে সাক্ষেতিক ডাক ছাড়লে —ল্যাওনচোস!

আমাদের ভাবাস্তর দেখে মাষ্টার মশায়ের সজাগ দৃষ্টি তীক্ষতর হ'য়ে উঠল। ওদিকে মুথিয়া আরও ছ-তিনবার অতি বিনীতভাবে ল্যাবেন-চোস্— ল্যাওনচোস্ বলে হঠাৎ বীরদর্পে চোওওস্ বলে এমন একটা হাঁক ছাড়লে যে, দেশকালপাত্র ভূলে আমরা ছ-ক্ষনেই হেসে ফেল্লুম।

আমাদের হাসতে দেখে মাষ্টার মশার রেগে উঠে এসে বিক্ষাসা করলেন—হাস্ছ কেন ?

ঠিক সেই মুখে ছুঁচোবাজীর চালে মুথিয়া আর এক হাঁক ছাড়লে— চোঁই ওঁই ওঁই ওঁই ও ও ওস্।

ব্যস্, আর যায় কোণায়! হাসি চাপা আর সম্ভব হোলো না, এবার আমরা জোরে হেসে উঠলুম।

আমাদের ধৃষ্টতা দেখে মাষ্টার মশার বললেন—আচ্ছা, তোমাদের কাঁদিয়ে ছাড্ডি।

বলার সঙ্গে-সঙ্গে ত্থানের ওপর এলোধাপাড়ি কীল, চড়, গাঁট্টা পড়তে লাগল। আমাদেরও কি রকম রোথ চেপে গেল—মাষ্টার মশায় দতই মারুন না কেন কিছুতেই হাসি থামাব না।

ওদিকে সেদিন বেন মুথিয়ার প্রতিভা খুলে গেল। সে অন্তুত রকমারী বাট-কর্ত্তবে 'ল্যাবেঞ্স্' শব্দটি হাঁকতে শুরু ক'রে দিলে। মোট কথা, লক্ষ্স্ চুবে-চুবে উপভোগ করার বাণীমূর্ত্তি সে ফুটিয়ে তুলতে লাগল সেই কৃতীয় প্রহরের রোদে পথে দাঁড়িয়ে।

এদিকে মাষ্টার মশার ছই হাতে বাজনা বাজাচ্ছেন আমাদের ওপর—
চটাচট, পটাপট। মুখ দিয়ে বেক্লছে একই সন্ধীত—কাঁদিয়ে তবে ছাড়্ব।
আর আমরা কাঁদতে-কাঁদতে উচ্চৈশ্বেহেনে চলেছি হা হা,হো হো, হি হি—

এই অভ্তপূর্ব কনসার্টের শব্দে বাড়ীর সবার নিবানিক্রা ছুটে গেল, তাঁরা ঘূলাড় ক'রে এক রকম ছুটেই নীচে নেমে আসতে লাগলেন। কিছু তথন ঘূ-পক্ষই অর্থক্ষিপ্ত। তাঁদের দেখে মাষ্টার মশায়ও হাত থামালেন না, আমরাও আগের মতনই হাসতে থাকলুম।

ইতিমধ্যে মা এদে ঘরে ঢুকলেন—উভয় পক্ষেরই ইচ্ছৎ বাঁচল।

মাকে দেখে মাষ্টার মশায় ও আমরা থেমে গেলুম। মা আমাদের বলতে লাগলেন—তোমরা বড় বাড় বেড়েছ! আচ্ছা হচ্ছে তোমাদের—

মা যেন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় বাইরে একটা গোলমাল ভনতে পাওয়া গেল! অনেক লোকের উত্তেজিত কঠন্বর ও মধ্যে-মধ্যে মুখিয়ার কায়ার আওয়াল পাওয়া বেতে লাগল। অন্ত সময় হোলে আমারা ছুটে বেরিয়ে বেতৃম, কিন্ত মাথার ওপরে অত-বড় একটা অপরাধের বোঝা থাকায় তখনকার মতন উথান-শক্তি রহিত হ'য়ে গিয়েছিল।

গোলমাল উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। হঠাৎ যেন তারই মধ্যে বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। কি রকম হোলো তাই ভাবছি, এমন সমর মনে পড়ল আব্ধ যে শনিবার।

আবার বাবার আওয়ার পাওয়া গেল। ম। আমাদের বললেন—দেখ তো, কি হয়েছে ?

বলা-মাত্র তড়াক ক'রে বেরিয়ে গেলুম। বাইরে গিয়ে দেখি, সে
এক বিরাট ব্যাপার! রাজ্যের লোক দাড়িয়েছে মুখিয়াকে ঘিরে!
তার লজ্ঞ্স রাস্তাময় ছড়িয়ে পড়েছে, কাঠের কাণা-উচু ভালাটাও এক
দিকে পড়ে রয়েছে। মুখিয়ার হাত-পাও মুখের স্থানে-স্থানে ছ'ড়ে
গিয়েছে—ছ-চোধ দিয়ে জল ঝয়ছে, কিছু কায়ার শক হচ্ছে না।

করণ সে দৃষ্ট দেখে আমাদের চোখে মল বেরিয়ে এল। সেধানকার তকাতকি—স্তনে ব্যালারটি যা বুঝলুম তা হচ্ছে এই—



পাড়ার শুটকরেক লোক ছিলেন বেকার। মুথিয়া নাকি প্রতিদিন বীভংস হস্কার ছেড়ে তাঁদের দিবানিদ্রার ব্যাঘাত জন্মার। এত দিন তাঁরা নীরবে তার এই অত্যাচার সহা ক'রে আসছিলেন,কিন্তু আজ নাকি খুব বাড়াবাড়ি করায় নিতাস্ত সহ্য করতে না পেরে অসময়ে অপ্রাগার ছেড়ে এই রোদে তাঁরা বেরিয়ে পড়েছেন তাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে। অধ্যাপনার কার্যাট প্রায় স্থসম্পূর্ণ হ'য়ে এসেছিল, এমন সময় বাবা এসে তাঁদের হাত থেকে মুথিয়াকে উদ্ধার করেছেন—এই সময় আমরা গিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

বাবা বলতে লাগলেন—ছি ছি, আপনারা কি মামুষ ! এই পঙ্গুকে ধরে তিন-চার জনে মিলৈ মারতে একটু মারা হোলো না আপনাদের ?

তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বললে—মশার, আগনি বা রাগী, আপনি হোলে মেরেই ফেলতেন ওকে।

বাবা চুপ ক'রে আছেন দেখে আর এক ব্যক্তি বললে—আপনিও তো মশার আছে। লোক! পাড়ার লোকে একটা কাজ না হয় ক'রেই কেলেছে। আপনি কোথায় সেটা চেপে যাবেন, না উল্টে ওর হ'রে লড়াই শুরু করেছেন! আশুর্ব!

তিনি কোনো জবাব দেবার আগেই আর এক জন বলে উঠ্লে—
ছেলেদের বন্ধ যে!

ভীড়ের লোকেরা হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

বাবা আর তাদের কথার কোনো উত্তর দেবার চেষ্টা না ক'রে ছেলেদের বন্ধর রূপথানি দেখতে লাগলেন। রূপ-তরাস কেটে গেলে মুখিয়ার এক-খানা হাত ধরে তাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন।

মুখিরার অবহা দেখে বাড়ীর স্বাই ছ: ব করতে লাগলেন। না তাকে জেরা করলেন—ভূই এ-বাড়ীর সামনে দাড়িরে অমন ক'রে চোচ্ছিলি কেন ? তারপর আমাদের ছ'জনকে দেখিরে বললেন—নিশ্চর এদের ডাক্ছিলি! বল, ডোর কোনো ভয় নেই।

মৃথিরা বললে—চলতে চলতে-ক্লান্ত হ'রে পড়লে এক জারগার দাঁড়িরে কিছুক্ষণ চেঁচানোই আমার অভ্যেস—ওদের ডাকবার আমার কি দরকার!

মা বললেন—আমি জানি, এরা তোর কাছে ধার ক'রে লক্ষ্পুদ খায়—এদের কাছে কিছু কি পাবি ?

সঙ্গে-সঙ্গে মুথিয়া প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—না না না, কিছু পাব না—ওরা আর ধারে খায় না।

এক মাস হল চেয়ে নিয়ে । থেয়ে মুখিয়া তার শৃক্ত ভালাটা বগলে নিয়ে চলে গেল।

মুখিরা চলে যাবার পর এই ব্যাপার নিয়ে বাড়ীর সকলেই আলোচন। করতে লাগলেন। বাবা ও মাষ্টার মশাই ছ-জনেই এই নিয়ে অনেক কথা বললেন।

বাবা বললেন—কেউ কারুকে ধরে মারছে, এ দৃশু আনি সহু করতে পারি না। বিশেষ ক'রে সে ব্যক্তি যথন উপ্টে মারতে পারবে না।

মাষ্টার মশায়ও দেধলুম এ বিষয়ে বাবার সঙ্গে একেবারে একমত।

সেদিন দিবানিজায় ব্যাঘাতের ব্দক্ত বাঁরা মুথিয়ার অব্দে ব্যথা দিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই দিবানিজা থেকে গভীরতর নিজায় অপহত হয়েছেন—কানি না, আত্বও নিজা ভেঙেছে কি না।

মাষ্টার মশায় কিন্তু পরদিন থেকে আর এলেন না। সে জ্বন্ত ছঃখ নেই, কারণ মাষ্টারের অভাব জীবনে কোনো দিনই ভোগ করতে হয়নি, কিন্তু মুখিয়া আর এল না, যার অভাবে মনের একটা জায়গা আভও থালি হ'য়ে আছে। রান্তা-ধারের জানাগার বসে আছি—পথ ক্রমেই জনবিরল হ'রে উঠছে। বেরিয়েছে তুপুর বেলাকার যত ফেরিওরালার দল। সে সমর অধিকাংশ বাড়ীরই বাবুদের দল বাড়ীতে থাকে না—মেরেদের কাছে জিনিব বিক্রি করা সহজ।

ঐ যার চুড়িওয়ালা—বেলোয়ারি চুড়ি চাঁইয়া—বালা চাঁইয়া— খেলোনা চাঁইয়া—

তথনকার দিনে সব বাড়ীরই রান্ডার দিকের বারান্দায় নীল কাপড়ে মোড়া চিক্ ঝুলত। রান্ডার চলা, ট্রামে-বাসে চড়া, কিংবা বাজার করবার ছলে সকাল থেকে দোকানে-দোকানে ঘুরে-ঘুরে সঙ্গের পুরুষ জীবগুলিকে নিম-খুন ক'রে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে ঘন্টা ছ্রেক ছল্লোড় ক'রে কল-ঘরে ঢোকবার রীতি বা সাহস তথনকার মেয়েদের ছিল না।

চুড়িওয়ালা হেঁকে চলেছে স্থর ক'রে—এক বাড়ীর ওপরকার বারান্দার চিক্ কাঁক ক'রে সক্ষ-গলায় কে যেন ডাকলে—চুড়িয়ালা!

চুড়িওয়ালার স্বাগ কান নারীকঠের এই কীণ আহ্বানের বৃদ্ধ সর্বদাই প্রস্তুত হ'রে থাকে।

সে থেমে গিয়ে জিঞ্জাসা করলে—কোন্ বাড়ী গো?
—এই যে, এই বাড়ী।

সদর দরজা খুলে গেল। চুড়িওরালা বাড়ীর মধ্যে চুকল—ভার পেছনে পেছনে পাড়ার একপাল ছোট ছেলেও চুকে পড়ল।

চুড়িওরালা উঠোনে তার সেই বিরাট ঝোড়া নামিরে একথানা চার-চৌকো পিচবোর্ডের টুকরো দিরে হাওরা থেতে লাগ্ল। ইতিমধ্যে বাড়ীতে বত মেরে আছে তারা একে-একে চুড়িওরালার সাম্বে একে দাড়াতে লাগল—বৃদ্ধা, প্রোচ়া, য্বতী, কিলোরী, বালিকা, শিশু—গৃহিণী, দাসী, ক্সা, বৌ—সধবা, বিধবা, পতিসোহাগিনী বা পতিপরিত্যক্তা কেউ বাদ গেলেন না।

চুড়িওরালা তার বোচকার বাঁধন খুলে ফেলল। ওপরেই নানা রকমের খেল্না, বাঁশী, চক্চকে ফুলদানী ইত্যাদি মনোহারী জিনিব। দেখামাত্র ছেলেদের মধ্যে আন্দোলন শুরু হোলো—তারা সবাই মিলে সশব্দে এই জিনিবগুলি সম্বন্ধ আলোচনা ও নিজেদের অভিজ্ঞতা জাহির করতে লাগল। এরই মধ্যে মেরেদের চড়ি দেখানো আরম্ভ হোলো।

এই চুড়িওরালারা প্রায়ই ছিল পশ্চিমবদের মুসলমান। কথাবার্ত্তা ছিল মিটি, মুখে একেবারে মধু মাখানো বাকে বলে। তাদের অমায়্যিক তিতিক্রা আত্তকের দিনে যে কোন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ছর্গত। পাচ মিনিটের মধ্যেই তারা সংসারে কোন মহিলার স্থান কোখার তা বুঝে নিয়ে বড়মা, ছোটমা, বৌমা, দিদিমণি প্রভৃতি ডাক শুরু ক'রে দিত।

তার পরে সেই মেরে-সভার চুড়ি গছল করানো—বীকা-মুটের পক্ষে অতি জটিল-রকমের অপারেশন করাও বোধ হয় তার চাইতে সোজা। একটা দুষ্টাস্ত দিই—

পাঁচ জন মহিলা ও একটি ছোট মেরে হয়ত চুড়ি পরবে। প্রথমে ছোট মেরেটির চুড়ি পছন্দের পালা। পঁচিশ রকমের চুড়ি দেখাবার পর এক রকম চুড়ি পছন্দ হোলো। দরে আর কিছুতেই বনে না। চুড়িওরালা বার-ছরেক তার বোচকা বেঁধে কেলে। শেষকালে সব ঠিক হ'রে বাবার পর চুড়ি পরাতে বাছে, এমন সময় এক জন বলে উঠলেন বে, তাঁর নামার বাড়ীয় পাড়ায় একজনের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে একটি ছোট মেরের হাতে তু-গাছি চুঙ়ি তিনি বে দেখেছিলেন—আহা, সে একেবারে চেবি ছুড়িরে বায়!

চুড়িওরালাকে সেই চুড়ির বিবরণ গুনিরে বলা হোলো—সেই রক্ষ চুড়ি দেখাও।

চুড়িওরালা অতি বিনীতভাবে বললে—না মা, সে রকম চুড়ি আমার কাছে আবু নেই, বলেন তো এনে দিতে পারি।

খুকুর মা এই স্থবোগে খুকুকে ফাঁকি দেবার তালে তাকে বললেন — তোকে ভাল চুড়ি পরে এনে দেবে, আন্ধ আর চুড়ি পরিস্নি।

খুকু অমনি পৌ ধরলে। সকলে মিলে তাকে বোঝাতে লাগলেন বে অচিরেই তার জন্ত এমন ভাল চুড়ি আসবে যে সে রক্ষটি আর কারুর হাতেই দেখতে পাওয়া যায় না।

বাক্যটির ব্যক্ষার্থ ধরে ফেলে খুকুমণি তার স্থর আরও এক গ্রাম উচ্চে ভূলে দিলে। খুকীর মা সহু করতে না পেরে রেগে তাকে দিলেন খা ত্র-ভিন।

কিন্ত খুকু তো আর থোকা নয়। যে-পাপ থেকে তাকে
নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে সে-পাপে সহজাত অধিকার নিরেই যে সে
এসেছে—সে থামবে কেন! একটা মহা হট্টগোলের পর সাব্যন্ত হোলো,
আচ্চা তা হোলে ঐ চড়িই খুকীকে পরিয়ে দেওরা হোক।

খুকীর বেলাতেই যদি এই হয় তা হোলে খুকীর মা, খুড়ী, স্বেঠিদের ব্যাপারটা সহজেই অফুমেয়।

এর পরে চুড়ি পরবার পালা। সে এক লাঠালাঠি, ফাটাফাট ব্যাপার! কারণ, সকলেই চান বে, চুড়ি হাতের কব্ জিতে একেবারে সেঁটে বসে বাবে। তাঁদের অধিকাংশের কব্ জিতেই যে ছোট বেরেদের মল সেঁটে বসে বাবার অধিকার রাখে, এক সোনার চুড়ি গড়াবার সময় ছাড়া সে খবরটা তাঁরা প্রার একেবারে ভূসেই বেতেন। সেই খন-ছুঁচের হাাদার ভাহাজের কাছি ভরার কসরং বালক-মহলে গুবই উম্ভোগ্য ছিল। এত কাণ্ডের পর, বোধহর ঘণ্টা দেড়েক বাদে চুড়িওয়ালা এক বাড়ী থেকে মুক্তি গেল। এত ক'রে তারা লাভ করত কি ক'রে তাই ভাবি— কারণ পরাতে-পরাতে চুড়ি ভেঙে গেলে তা চুড়িওয়ালার বেত—বোধহর চুড়ি পরানোটুকুই ছিল তাদের লাভ।

চলেছে ফেরিওয়ালা এক-এক জন এক এক ছবে হেঁকে—আমাদের
মগজে চিত্রবহার তরঙ্গ তুলে। বাসনওয়ালা চলেছে, তারা হাঁকে না—
বাজায়। রকমারি বাজনা সে—গিয়িরা শুনেই বলে দিতে পারতেন, কার
কাছে কি ধরণের বাসন পাওয়া যায়। ঐ যায় বেদের মেয়ে, পিঠে পোঁট্লা
বাঁধা। ক্ষীণ দেহবাঁট কিন্তু তীক্ষ চীৎকার ক'রে ভারতের রাজধানীর
বুকের ওপর দিয়ে ঘোষণা করতে-করতে চলেছে—ব্যাত ভালো করি—
দাতের পোকা বের করি—এমন মন্ত্র ঝাড়বে যে দাতের পোকার
বাবা তো দ্রের কথা তাদের তিন কুলে যে যেথানে আছে পিল্-পিল্
ক'রে বেরিয়ে আসতে পথ পাবে না। শুনতুম ওরা না কি আরও অনেক
সাংঘাতিক রকমের তুক্-তাক্, ঝাড়-কুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র জানে, কিন্তু ছাড়ে না।

ঐ আসে মাড়োয়ারী কাপড়ওয়ালা—রামণিঙের মতন আওয়াজে পাড়া কাঁপিয়ে—একটি—য়াকায়—তিন খা—না কাপড়—এক্থি—য়ানা কাউ !!!

টাকায় চারধানা ধৃতি! হোক না কেন সে পাঁচ-হাতি! আৰু বে একধানা ক্রমালের দাম পাঁচ সিকে। কিন্তু আশ্চর্য! সেদিনও মাতব্বরদের মুখে শুনেছিলুম—কি ছুর্দিনই না পড়েছে!

ছুর্দিনের জয়ডকা কালের বুকে চিরদিনই বেকে চলেছে। মাহব রাজ্য জয় করবার কৌশল শিখেছে বটে কিন্ত ছুর্দিনের কাছে তাকে চিরকাল হার-মানতে হয়েছে।

এই তুপুরের বাত্রীদের মধ্যে আর এক জনের কথা মনে পড়ছে—সে ছিল ভিধারী, অন্ধ ভিধারী। ধুব লঘা-চওড়া ও ক্টপুট চেহারা ছিল তার—বিশেষ কোরে পা ছ্-ধানা ছিল তার অভ্ত। অত বড় লখা-চওড়া ও শক্তিব্যঞ্জক পা পালোয়ানদের মধ্যেও হুর্লন্ত। তান হাতে তার মাধা সমান উচু একটা মোটা বাঁশের লাঠি ঝুলত আর বা হাতে ঝুল্ত একটা রোগা কালো মতন প্যাংলা মেয়ে।

আদ্ধ আবার গান গাইত। বেমন ছিল তার বিরাট দেহ, তেমনি ছিল তার কঠমর। উ:, সে যেমন গন্তীর, তেমনি কর্কণ ও তীক্ষ। কিছ গাইরে হওয়ার পক্ষে এতগুলি প্রতিকৃল গুণাবলীর সমাবেশ সম্বেও তার গান পড়শীদের বৃক্ষে করুণার প্রস্রবণ ছটিয়ে দিত, এমনি দরদ ছিল তাতে।

অন্ধ গান গেয়ে চলেছে কর্কশ কণ্ঠে, কিন্তু তার সমস্ত অক্ষমতা ভেদ ক'রে ক্ষয়-বেদনা শতধা উৎসারিত হচ্ছে।

অন্ধ গান গেয়ে চলেছে, সে গান নিশ্চয় তার নিজের রচনা নয়।
চমৎকার গান—অন্ততঃ সে সময় খুবই ভাল লাগত। আজু সে গানের
কথা ও স্থর স্থতি থেকে মুছে গেলেও ভাবটা সনে আছে।

আৰু গান গেয়ে চলেছে—অন্ধের যা কট তা ধৃতরাট্রই জানেন আর জানেন সেই অন্ধ মৃনি—তিন যুগের ব্যথার চল নামল গুরু ত্পুরের বুকে! গান গেয়ে চলতে-চলতে এক জায়গায় এদে আন্ধ দাঁড়িয়ে বললে—মা জননী, অন্ধকে একটি পয়গা দিন।

সঙ্গে-সঙ্গে সেই মেরেটা পি-পি শব্দে টেনে-টেনে স্থর ক'রে চীৎকার করতে আরম্ভ করলে—মা গো, দয়া ক'রে অন্ধকে একটি পয়সা দিন।

হরত কোনো গৃহস্থবধূ তাকে একটা পরসা দিলে কিংবা কেউ-ই কিছু দিলে না। অল্প কিছুক্ষণ চেঁচামেচি ক'রে আবার অন্ধ ফিরলে সামনের দিকে, আবার স্থক্ন হোলো সেই গান আবার স্থক্ক হোলো তার বাতা।

আৰু গান গেরে চলেছে—আমি শুনেছি মাধার ওপরে নাকি আকাশ আছে, তার রং নাকি নীল। রাত্তিবেলা নাকি আকাশে কক্ষকে সৰ ভারা কোটে, সে দৃখ্য নাকি খুব ফুন্দর। কিছ নীল বা বৰুককে কাকে বলে তা আমি জানি না—আমি তো অছ!

তার সেই নিদারণ অভিযোগ আমাদের অন্তরে বে তর্ম ভূপত তা একমাত্র বাসক-মনেই সম্ভব।

আছা গেরে চলল—গুনেছি নাকি গাছে নানারকম ফুল হর, বিচিত্র ভালের রং ও রূপ। সেধানে না কি প্রজাপতি ওড়ে, তাদের রং ও রূপ বিচিত্রতর। হার! আমি যে অন্ধ, আমার কিছই দেখা হোলা না।

তার গানের মধ্যে একটা কথা বিশেষ ক'রে মনে আছে বেটা শাখত সত্য। প্রত্যেক লোকেই জীবনে তা হয়ত বছবার উপলব্ধি করেছেন। সে কথাটি হচ্ছে—জাঁখি নেই বিধি দিলি আঁখি জল—

এই অন্ধের সঙ্গে ছেলেবেলার আর একটি শ্বতি জড়িরে আছে।
আমাদের বাড়ির প্রায় সামনেই একজনেরা থাকতেন। ভাড়াটে বাড়ি
হোলেও বেশ বড় বাড়ি, অবহা সচ্চল ছিল তাঁদের। ছেলেরা ছ-জন
কলেজে পড়ত আর ছ-জন চাকরী করত। বাড়ির কর্তা ভাল চাকরি
করতেন—চোগা চাপকান পরে ছই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ভাড়াটে গাড়ি
ছড়ে রোজ আপিসে বাওয়া-আসা করতেন। এ ছাড়া দেশে জমি-জমা
ছিল এবং সেখান থেকে আমদানীও মল ছিল না। সেখান থেকে
প্রায় তরি-ভরকারী ও ফল-মূল আস্ত এবং বাড়ির গিরি পাড়ার
প্রায় সব বাড়িতেই সে সব জিনিব বিভরণ করতেন। তাঁদের বাড়িতে
ছোট ছেলে-পিলে কেউ ছিল না বটে, কিন্তু গিরির মেলাল ও ব্যবহারটি
গ্রমন বর্দ্ব ছিল যে পাড়ার অধিকাংশ ছোট ছেলে ও মেয়েদের আড্রা
ছিল সেধানে! বাড়ির কর্তা মাবে-মাবে ছেলেদের চার নহরের ক্টবল
কিনে বিভেল—বিকেলে তাঁদের বড় উঠোনে আমরা খেলডুম। পাড়ার
প্রায় সব ছেলেই এখানে বাডারাত করলেও আমরা ছ্-ভাই এদের
ভারি প্রিরণাত্র ছিলুম, বোধ হয় সামনা-সামনি বাড়ি থাকার।

কিছু দিন পরে বাড়ির বড় ছেলের বিরে হোলো। বিরে, ক্রেন্ডাত প্রভৃতি সেরে তাঁরা দেশ থেকে কিরে এলেন। আমরা বোঁ দেশপুন। অমিনারের মেরে, রং খুব কর্লা না হোলেও বেশ দেখতে—বছর চোজ-পনেরো হবে। চমৎকার হাসি-হাসি মুখ, টানা-টানা চোখ। বিদেশে খণ্ডরবাড়িতে এসে তখনকার দিনে মেরেরা বে-রকম কারাকাটি করত তার সে রকম কোন বালাই ছিল না, বরং আমাদের মতন এক্তঞ্জলি বাচ্ছা দেওর দেখে সে বেশ খুশিই হ'রে উঠল। কনে-বৌ অবফাতেই সে একদিন গাছ-কোমর বেংখ আমাদের সলে উঠোনে নেমে পঞ্জ, ফুটবল খেলতে। কিন্তু সে এক দিনই, খুব সম্ভব তার শাশুড়ী বারণ ক'রে দিয়েছিলেন। তবে অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের সলে সমানে থগড়া ক'রে ভাগেগুলি খেলেচে।

যা হোক, ঐটুকু মেয়ে—আমাদের চাইতে আর কতই বা বড়
ছিল নে, সেই এক পাল ছেলেকে নে একবারে হাতের মুঠোর
মধ্যে এনে ফেলেছিল। এমনি ছিল তার আফর্ষণী শক্তি। খুথের
কথা থসবার আগেই আদরা তার কাল ক'রে দিভূম। বৌদির কোনো
ছঃধই ছিল না, অস্তত আমরা বুবতে পারতুম না—তবে বাড়ী খেকে
একলা বেরিয়ে নিজের ইচ্ছামত এর-ভার বাড়ীতে খুরে-খুরে পল্ল করা
অর্থাৎ মনের খুথে পাড়া-বেড়াতে পারে না বলে মাঝে-মাঝে আমাদের
কাছে চাপা ছঃধ প্রকাশ করত।

একদিন হপুর বেলা আমরা ছ-ভাই এই রক্ম জানালার বসে আছি, ল্রে আছ ভিগারীর গান ভনতে পাওরা বাছে, মুখ ভূলতেই চোথ পদ্ধন, বৌধি বারান্দার চিক্ কাঁক ক'রে দ্রে আছেকে বেশবার চেষ্টা করছে। আছ তাদের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই বে বারান্দা থেকে সরে গেল।

এक वारक दे त्रथन्य, त्योवि छात्मत नमत नतक। चूटन नामा वाक्टित

রাভার ছ-দিকে দেখতে লাগল—লোকজন কেউ কোণাও আছে কি লা! গ্রীমের ছপুর, রাভার লোকজন নেই, খাঁ-খাঁ করছে—একমাত্র সেই ভিথারী ও তার হত্তলয় কল্পা ছাড়া।

ভিধারী বাড়ীর সাম্নে বরাবর আসতেই বৌদি দরজা খুলে বেরিরে টপ্ ক'রে তাদের বাড়ীর রকে উঠে পড়ল। রকের ঠিক নীচেই একেবারে ভিতের গা-দেঁবে হাত-ত্ই চওড়া একটা নদ্দমা ছিল—সে সমরে শহরে অনেক রাস্তাতেই ত্-পাশের বাড়ির গা দিয়ে এই রকম খোলা নদ্দমা থাকত।

দেখলুম, বৌদি বিনা আয়াসে একটি লক্ষে একেবারে নদ্দা টপ্কে রাস্তার পড়ল। তার পরে ভিথারীর হাতে পয়সা দিয়েই মারলে দৌড় বাভির দিকে।

ভিপারীর আশীর্বাণী তথনো শেষ হয়নি—দরজার সামনেই আমের খোশার পা পড়ে বৌদি সশব্দে আছাড় খেল, সেই নদ্দমা-ঢাকা পাধরের ওপরে।

ভিথারী গান গাইতে-গাইতে চলে গেল! আমরা দেখছি, বৌদি আর ওঠে না। তু-একবার ঘেঁষড়ে, ঘেঁষড়ে দরজার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রে এলিয়ে পড়ল!

আমরা ছুটে বেরিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলুম, কিন্তু আমাদের সাধ্য কি যে তাকে তুলি! শেষকালে কোনো রক্ষম হেঁচ্ছে-টেনে তাকে বাড়ীর মধ্যে নিম্নে গেলুম।

বৌদি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই দাঁড়াতে কিংবা চলতে পারলে না—কাঁদতে-কাঁদতে আমাদের বললে—কোনো রক্ষে আমাকে বরে নিয়ে চল।

ছুই ভাই তার ঘূই হাত ধরে ছেঁচ্ডাতে ছেঁচ্ডাতে ওপরে নিরে গিমে তাকে বিছানার ভইয়ে দিলুম। বছণার চোটে দেখতে-দেখতে তার মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হ'রে উঠল। আমরা তার কট দেখে ব্যতিবান্ত হ'রে তার শাশুড়ীকে ডাকবার উপক্রম করছি দেখে সে বললে—এখন যা, বিকেলে আসিস্—কারুকে কিছু বলিস্নি যেন!

বিকেলে সেধানে বাওরা হরনি। সন্ধ্যা বেলা মা বললেন—ও-বাড়ীর বৌমার কি হয়েছে, তু-তু-জন ডাক্তার এল।

পরের দিন বিকেলে বৌদিকে দেখতে গেলুম। এক দিনেই তার চেহারা একেবারে শুকিরে গিরেছে, শুনলুম, কল-ঘরে পড়ে গিরে তার পারের হাড় ভেঙে গিরেছে, কাল সকালে অজ্ঞান ক'রে হাড় জোডা লাগানো হবে।

একটু নিরালা হ'তেই বৌদি আমাদের বললে—একটা কথা বলব, রাধবি ভাই ?

—নিশ্চয় রাথব।

— আমি এদের বলেছি যে কল-খরে পা পিছলে পড়ে গিরে চোট লেগেছে। ভিকিরিকে পরসা দিতে গিরে রান্তার পড়ে গিরেছিলুন জানতে পারলে এরা আর আমায় আন্ত রাধবে না। লক্ষী ভাই, ভোরা কারুকে কিছু বলিস নে যেন।

পরত্ব: ধকাতরতা তথনকার দিনেও গুণ বলেই বিবেচিত হোতো, কিন্তু পরত্ব:থে কাতর হ'রে বৌ-মাছ্যের রান্তায় বেরিয়ে যাওয়া অমার্জনীয় ছিল।

বৌদির পারে কাঠ বসিরে ব্যাপ্তল বাধা হোলো বটে, কিন্তু অত্থ তার আর সারল না। দিনে-দিনে নানা উপসর্গ জুটে অবস্থা ক্রমেই জটিল হ'রে উঠতে লাগল। দেশ থেকে তার বাপ-মা এলেন, সারেব ডাক্তারও এল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না। ছ-দিনের জন্ত এসে স্বাইকে আপন ক'রে, পাড়াশুভ ছেলেমেরেকে কাঁদিরে এক দিন সে বিশ্বাস ক'রে এক দিন সে আমাকে বে ঋণে আবদ্ধ করেছিল আজ বিখাসঘাতকতা ক'রে সে ঋণ শোধ করনুম।

জানালার থারে বলে আছি—বাইরে জগং গড়িয়ে চলেছে, রোদও-গড়াডে-গড়াডে গলি পেরিয়ে চলে গেল। ঠিকে-ঝিরা সব কাজে আসতে লাগল। বিকেল হওয়ার সজে-সজে রাস্তার রংই বদলে গেল।

ত্পরের কেরিওরালার দল চলে গেছে অনেক দ্রে। বিকেলের কেরিওরালারা প্রার খাবার-দাবার ও সৌধিন জিনিব বিক্রি করে। একটা জিনিব সেকালে খুবই চলত, সেটা হচ্ছে ব্রাহ্মণ-বেকারির পাঁউফটি-বিক্রট। মাথার টিনের বাল্ল, খালি গায়ে গলায় লখা পৈতে-ঝোলানো ব্রাহ্মণ কেরিওরালার দল বেরুত। শীতকালে জামার গলার কাছে পৈতের খানিকটা বের করা থাকত। সেদিনের হিসেবেও সেগুলোছিল যাচ্ছে তাই থাতা। সে সময় পাঁউফটি থাওয়ার রেওয়াজ খুবই কম ছিল, বিশেব ক'রে মুসলমানের দোকানের কিংবা গ্রেট ইস্টার্গ হোটেলের পাঁউফটি অধিকাংশ বাড়ীতেই চুকতে পেত না!

চলেছে বিকেলের কেরিওয়ালার দল— ঘুগ্ নিদানা, নকলদানা, চীনেবাদান, চানাচুর, পাঁঠার ঘুগনি, ডিমের ঘুগনি, আলু-কাচালু, প্রভৃতি যত সব মুধরোচক ও প্রাণঘাতক অথাছ। পাঁঠার ঘুগ্নি, ডিমের ঘুগ্নি ছেলেরা লুকিরে থেত। সাধারণ লোক প্রকাশ্রে মুরগী অথবা মুরগীর ডিম থাওয়ার কথা ভাবতেও পারত না। হাঁসের ডিমও অনেক বাড়ীর হেঁসেলে চুকতে পেত না, বিশেষ ক'রে বে বাড়ীতে উড়ে-বামুন পাচক থাকত। এই উড়ে-বামুনের প্রসক্ষে একটা মন্ধার কথা মনে পড়ল।

সেকালে, তথু সেকালে কেন, একালেও অনেক বাঙালী গৃহত্বের:
বাড়ীতেই উৎকলবানী আহ্বণ রাখা হর রামা করবার জন্ত। কেনকালি না, এই শ্রেণীর আহ্বণের ডিমের প্রতি বাহ্বণ বিভূকা ছিল।
আনালের একটি বিশেব জানালোক উডিয়ার কোন দেশীর রাজে চাকরী:

. :

করতেন। মাঝে-মাঝে ছটিতে ভিনি বাড়ীতে অর্থাৎ কলকাভার এসে किছ मिन क'रत कांग्रिस (वर्ष्टन। धर्ट त्रकम जमरत धक मिन जकांन বেলার ভত্তলোক বাড়ী থেকে বেরিরেছেন, এমন সময় সামনের বাড়ীর ঠাকুর কি কাজে বেক্সচ্ছিল—পড়ে গেল তাঁর সামনে। লোকটাকে তিনি চিনতেন, কারণ চাকুরী-স্থানে তাঁর বাগানে সে দিন-কয়েক মালীর কাঞ্চ করেছিল। সে ছিল কাতে 'পান' অর্থাৎ হাড়ি-মুচী শ্রেণীর -- কলকাতার এসে গলায় গৈতে ঝুলিয়ে বামুন সেজে লোকের জাত মেরে বেড়াচ্ছিল। দেখানে সে কাজ করত, তাঁরা : ছিলেন অত্রাহ্মণ। তাই রাঁধুনী-বামুন হোলেও শাগমন্তির ভরে তাঁরা তাকে বতদুর সম্ভব সম্ভন ক'রেই চলতেন। কিছ বাঁহাতক প্রকাশ হওয়া বে, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নর, অমনি পাডার লোকদের সঙ্গে তাঁরোও তাকে ধডাধ্বড পিটতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। লোকটা তো পালিমে বাঁচল—তথুনি ঠিকে-গাঙি চড়ে বাড়িওছ ছেলেমেরে নিরে তাঁরা গলা নাইতে ছুটলেন এত দিনের হক্তম-করা পাপ থণ্ডাবার জন্ত। সেদিন আর তাঁদের বাড়ী হাঁড়ি চড়ল না। এ বুকুম ব্যাপার নিতা ধরা না পড়লেও অনেক অবান্ধণকে কলকাতায় এসে দারে পড়ে যে ব্রাহ্মণ হ'তে হোতো সে কথা বলাই বাছলা।

ছাতে

ছাতের ছবি সারাদিন ধরেই বদলে চলত সেকালে। বাড়ীর সব চাইতে উচ্চে ও সবার মাধার ওপরে থেকেও প্রতিদিন নিজের অলে সে এত ধূলো মাথে কোথা থেকে, ছেলেবেলা সে একটা সমস্তা ছিল। তা ছাড়া, আর এক রকম কালো-কালো ওঁড়ো, ধূলোর চেম্বে একটু শক্ত জিনিয—সেগুলোই বা কি? ছ-পা চলতে না চলতে পারের তলাটা একেবারে কালো হ'রে যায়।

খ্ব ভোরে ছাতে উঠে দেখেছি, দ্রে এক বাড়ির ছাতে এক জন সক্ত-রোগম্ক্ত—রান্তায় বেরুবার শক্তি নেই কিন্তু চলচ্ছক্তি আছে, ধীরে-ধীরে বেড়াছে। হু-এক জন অতি-বৃদ্ধকেও দেখেছি, এই সময় ছাতে উঠে ,তাঁরা আয়ু বাড়াবার চেষ্ঠা করতেন। রোদ ওঠার সঙ্গে-সন্দেই কিন্তু এই দল নীচে নেমে যেতেন। বাস্, বাড়ীর পুরুবদের সঙ্গে ছাতের সম্পর্ক এই পর্যন্ত। কারণ, অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে আসার পূর্বে পুরুবেরা আর ছাতে উঠতে পারতেন না—পাড়ায় সন্ভাব রেখে বারা থাকতে চাইতেন তাঁরা এ নিয়মটির প্রতি থবই সভাগ থাকতেন।

বৃদ্ধ ও রুগ্নের দল নেমে গেলে বি উঠল ছাত বাঁট দিতে আর সন্ধ্যোবেলায় মেলে-দেওয়া কাপড়ের আণ্ডিল কুঁচিয়ে, পাট ক'রে তুলতে। এই ছাত বাঁট দেবার সময়টা ছিল ভাদের সকালবেলা বিশ্রামের সময়। একবার ছাতে চড়তে পারলে আর নামবার নামটি নেই। নীচে থেকে গিলিরা চেঁচাচ্ছেন, ঝিয়ের কানেও পৌচচ্ছে না। যদি বা একবার সাডা দিলে তো কাল তথনো অনেক বাকি। শেষ কালে গালাগালি দিয়ে এক রকম টেনে তাকে নীচে নামানো হোলো—
এ ব্যাপার প্রায় প্রতি সংসারেই প্রতিদিনকার ব্যাপার ছিল। অনেক
গিন্নিকেই বলতে ভনেছি যে, ওরা সারা রাত জাগে কি না তাই
ছাতে উঠে ঘূমিয়ে পড়ে। কিন্ত আসল কথা, তারা ছাতে গিয়ে
ঘূমোত না, সেখানে গিয়ে জেগে উঠত।

তথনকার দিনে, শুধু তথন কেন এখনকার দিনেও ঝি-রা থাকে বন্তির সংধ্য খোলার বাড়ীতে। সে সব বাড়ী আমরা দেখেছি। ছোট্ট একখানা বর, মাটির দেওয়াল, মাটির মেজে, খোলার চাল। হয়ত কোনো বরে একহাত চৌকো বাঁলের জালি দেওয়া একটু জানালা। সে মেজেতে শোওয়া যায় না, তাই তক্তাপোষ একখানা করতেই হয়। তক্তাপোষের চারটে পায়ার নীচে ইট দিয়ে-দিয়ে সেখানাকে য়ত দ্র সম্ভব উচু করা! কারণ, তক্তাপোষের নীচে সেই জায়গাটুকুতে হাঁড়ি-কুঁড়ি, বাসন, ভাঁড়ার, জলের কলসী, পানের বাসন প্রভৃতি থাকে এবং সেইখানে বসেই খাওয়া-দাওয়া চলে।

পাশাপাশি ঘর প্রায় চারদিকেই, মাঝখানে ছোট্ট একটি উঠোন। উঠোনের এক কোনে একটা কুয়ো। এই কুয়োর জলই ব্যবহৃত হয়, য়ার গতর আছে সে রাজার কল থেকে থাবার জল সংগ্রহ করে। ঘরের সামনে হাত-ভিনেক চওড়া একটু বারালা মতন, এই বারালা অথবা দাওয়া বার ঘরের সামনে হতটুকু পড়েছে সেইটুকু রায়া করবার জায়গা। দাওয়ার চালটা উঠোনের দিকে এতথানি ঝোলা য়ে,য়ে-কোনো সাইজের বয়য় লোককে প্রায় গুঁড়ি মেরে চুকতে হয়, অসাবধান হোলে মাথা বাঁচানো দায়। ঘরে আলো-বাতাস একদম ঢোকে না বললেই চলে। শব্দ গুনে টের পতে হয় বে বাইরে য়ড় উঠেছে কিছ চার কোটা বৃষ্টি হোলেও তা চালের কাঁক দিয়ে ঘরে পড়ে। তার ওপর বাড়ীর মধ্যে কি গছ! উঃ, সে কথা মনে করলেও পাপ হয়!

এই নরককুণ্ডের মধ্যে বাস ক'রে মনিব-বাড়ীর উচু ছাতে উঠে সকাল বেলাকার সেই বল্মলে আলো, দ্র-দিগন্ত অবধি উচু, নীচু ছোট বড় বাড়ী, এর মধ্যে-মধ্যে নারকোল ও কেইচুড়া ফুলের গাছ, কোন্ দ্রে কলের চিম্নি দিরে ধোঁারা উঠছে, কোন মন্দির-চুড়ার অর্ণকুন্ত বক্-বক্ করছে! অনেক-অনেক দ্রে মনিমেন্ট দাড়িরে আছে. প্রথম দৃষ্টিভেই আবার তাকে দেখা বার না. উচু-উচু বাড়ীগুলোর মধ্যে আত্মগোপন ক'রে থাকে—এ সুবই বে তার কাছে নতুন, তার জীবনরাত্রার সীমার বাইরে। এই বিশ্বরলোকে জেগে উঠে তারা আত্মহারা হ'রে বেত—গিরির কর্কণ চীৎকারে সন্থিত ফিরে পেয়ে আবার কাজে লেগে বেত।

এ আমার কল্পনা নয়। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ীতে একজন ঝিছিল, তাকে আমরা জন্মাবধিই দেখেছি। খুব বরস হয়েছিল তার, কোমরটা এমন বেঁকে গিয়েছিল যে হাঁটবার সময় নীচের দিকে মুখ ক'রে চল্ত। ভার হ'তে না হ'তে সে আসত। বল্ত, সারা-রাত ঘুম হয় না, রাত পোরালেই বেরিরে পড়ি। বেলা দশটা নাগাদ চলে বেত আবার আসত তিনটের আর বাড়ী ফিরত রাত্রি ন-টায়—কোন দিন আমরা আমার ধরলে রাত্রে বাড়ী থেত না—আমাদের কাছে শুরে গল্প বলত।

শরতের মাকে কোন কাল করতে হোতো না শুধু আমাদের, অর্থাৎ ছোট ছেলেমেরদের তদারক করতে হোতো। সে কাল বে কতথানি শক্ত তা বেদিন সে কাশাই করত সেদিন বাড়ার সবাই হাড়ে-হাড়ে ব্রতে পারতেন। শরতের মা তার নিজের জীবনের ছ:খের কাহিনীগুলোকে খুব মর্মস্পর্নী ক'রে বলতে পারত। প্রথানত এই গুণেই সে আমার মতন সাংঘাতিক ছাই ছেলেকেও বলে এনেছিল। তারই মুখে শুনেছি বে প্রথম-প্রথম চাকরী করতে এসে ছাতে গিরে চারিদিকের মুক্তের মধ্যে সে নিজেকে হারিরে কেলত—ছ্-তিন আহগার এই স্থাপন্থাধে চাকরীও সিরেছে।

শরতের মার আর একটি ওণ ছিল এই বে, তাকে ব'কে-ঝ'কে গালাগালি দিরে কেউ রাগাতে পারত না। গালাগালি দিলে সে কোললা মূথ হাঁ ক'রে হাসতে থাক্ত। হঃধ পেরে-পেরে সংসারের কাছে এমন নিঃশেষে সে আত্মসমর্পণ করেছিল যা 'যোগিজনোচিত' বললেও অত্যক্তি হর না।

শরতের মা বল্ত যে খুব ছোটবেলা থেকেই সে কাজ করতে আরম্ভ করেছিল। তাদের দেশের এক বড়লোকের বাড়ীতে তাদের আড়াই বছরের মেয়ের খেলার সলী হ'য়ে বখন সে প্রথম চাকরী করতে ঢোকে তখন তার বরেল আট বছরের বেশী হবে না। বড়লোকের বাড়ী, চড়ুর্দিকে কত রকমের সব জিনিব পড়ে থাকে বা তার চোখে আগে কখনো পড়েনি—ভাঙা চুড়ির ঝক্ঝকে টুক্রো, কাগজের ভাঙা বাল্প, হাত-পানাথা ভাঙা মাটির পুতুল, ছেঁড়া রেশমের ও রঙিন কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি মহামূল্য জিনিব বেখানে যা কুড়িয়ে পেত তাই নিয়ে বাড়ীর এক জায়গায় সে খেলা-ঘর জমিয়ে তুলেছিল। মেয়েটিকে নিয়ে সে এই খেলা-ঘরে গিয়ে বলত। সে খেলতে থাক্ত আর মেয়েটি চুপচাপ বলে একমনে তার কথা শুনত আর খেলা দেখত।

কিছুদিন থেলা দেখতে-দেখতে মেরেটিরও থেলবার সধ চাপল।
তবন স্থক হোলো ছ-জনে ঝগড়া। একদিন একটু বাড়াবাড়ি হ'তেই
মেরেটা উঠল কেঁদে, ফলে ছ-তিন জন গিন্নি ছুটে এলেন ওপরে।
ছ-পক্ষের কথা ভনে তাঁরা তার সব জিনিবপত্র টেনে এনে মেরেটিকে
দিয়ে তাকে বললে, এ সব জিনিব কি ভুই তোর বাপের বর থেকে
নিয়ে এসেছিলি ?

त्त वनान-जामात्र जिनिव त्कत्रछ ना नित्न जामि कांक कत्रव ना । छोत्रा वनान-नृत र'रत्र वा'!

এरे अविषे वर्ण रा अक्टा नियान स्कान वनछ—किंद्र हुई रा

হওরা বার না, তা আমার অস্তরান্তা জানত। তাই তাদের চোথের সামনে থেকে সরে গিয়ে বাগানের দিকের একটা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, গরাদ ধরে।

বেলা গড়াতে লাগল। ছ-একবার তারা খেতে ডাকলে কিছ স্থামার জিল—জিনিব না পেলে কিছতেই খাব না।

ক্রমে সন্ধ্যে হ'রে গেল, চারিদিক্ অন্ধকার থম্থম করছে, আমার ভয় করতে লাগল। মনে হোতে লাগল যে, মার কাছে চলে যাই, কিন্তু সেও অনেকখানি অন্ধকার পেরুতে হবে। ভাবছি লাগাই দৌড়— এমন সময়ে বাগানের দিক থেকে কে যেন ডাকলে—শোন।

এত ভয় করছিল তো, কিছু আওয়াজটা কানে যেতেই আমার সব ভয় চলে গেল। মুথ ফিরিয়ে বাগানের দিকে চেয়ে দেখি যে জানালা থেকে একটু দ্রে এক জন লোক শৃত্যে দাঁড়িয়ে আছে। তার নাক, মুখ, চোথ কিছুই ভাল ক'রে দেখতে না পেলেও সে যে মাহ্মর তা বেশ বোঝা যেতে লাগল। আমাকে বলতে লাগল—ভূই এ বাড়ির ঝি, ঝিয়ের আবার অভিমান কিসের রে! তোকে জীবন ভোর ঝি-গিরি ক'রে থেতে হবে, এ রকম অভিমান করলে সারা জীবন কষ্ট পাবি।

এই রকম সব অনেক কথা, সব কথা আজ মনে নেই—বলতে বলঙে লোকটা শুক্তেই মিলিয়ে গেল।

সে বলত—সেই থেকেই ঠিক করলুম, ভগবান যদি আজকের দিনটা আমার ভালয়-ভালয় কাটিয়ে দেন, তা হোলে আর কথনো অভিমান করব না। তা ভগবান ভালয়-ভালয় কাটিয়ে দিলেন। একটু পরেই সেই মেয়েটিয় মা এসে আমার জিনিষপত্র ফিরিয়ে দিয়ে আদর ক'য়ে ভেকে নিয়ে গিয়ে নিজে সামনে বসে খাওয়ালেন।

সেই কথাগুলো বে আমায় বলেছিল সে নিশ্চয় কোন দেবতা-টেবতা

হবে। কারণ, তার কথাগুলো ঠিক ফলে :গেছে—আমাকে সারাজীবন থেটেই থেতে হোলা। স্থামী, পুত্র কেউ আমাকে ভাত দেরনি। সারা জীবন ধরে আপনার লোক ও পর কত অন্তায় করেছে, অত্যাচার করেছে আমার ওপর, কিন্তু কারুর ওপরে রাগ বা অভিমান করিনি। নিজের বরাতকেই দ্বেছি। এই জন্ত,ভগবান আজও আমাকে অন্নবন্তের হুংধ্দেন-নি।

বাদ্যকালে, অহভূতির অরুণরাগে মানসাকাশ বখন সবে-মাক্র রাঙিয়ে উঠছে, সেই সময় শরতের মার এই কাহিনী সেখানে একখণ্ড কালো মেঘ ঘনিয়ে তুলেছিল, এত দিন পরে এখানে তার বর্ষণ হ'য়ে গেল। আবার ছাতে ওঠা যাক!

ঝি ছাত থেকে নেমে যেতেই বাড়ীর মেয়েরা ছাতে উঠতে আরম্ভ করলে। একসকে নয়, পরে পরে, য়ার য়ঝন য়ান শেষ হচছে। আস্ছে একে-একে—কিশোরী, যুবতী, প্রোঢ়া, ঝালি পিঠে ভিজে চুল এলানো। সকলে নিজের শাড়ী প্রভৃতি পরিপাটি ক'রে ভকোতে দিয়ে নেমে গেল।

সে-যুগে বাঙালী পরিবারে ফ্রকের এত বাহল্য ছিল না। অনেক বাড়ীতে পাঁচ-ছয় বছরের মেয়েরাও শাড়ী পরত। তার পরে আস্তে লাগল কাঁথা, মাতুর সতরঞ্চি, মশারি, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, কি নয়! ছাতে কাপড় শোকানো দেখে বাড়ীর হাল-চাল সম্বন্ধে অনেক কথাই বলে দিতে পারা বেত।

এর পরে গ্রীম্মের থব রোদ পোহাতে এল আমসভ, আমচ্র, জারক-লেবু, গুল ইত্যাদির দল। গিন্নিরা যে-যার শম্ব-গৃহে চুকে পড়লেন। বাড়ীর মধ্যে সব চাইতে ভাগাহীনার ওপরে রইল ছাতের ওপরকার ঐ মহার্থ দ্রব্যগুলির তদারকের ভার—গুধু কাক নয়, বাড়ীর ছোটরাও ফে তক্কে-তকে ফিরছে, সে কথা সবাই জানে। প্রকৃতি দেবী নারীরই স্কাতি, মধ্যে-মধ্যে বিজোহ করা তাঁর স্কাব। তাই গ্রীমের দারণ বিপ্রহরকে চমকে দিরে হঠাৎ আকাশ কালো ক'রে মেদিন তিনি ঝড় তুলতেন সেদিন লাগত মলা। রান্ডার ধূলো পাক খেরে-থেয়ে উঠতে লাগল ঘরে ও ছাতে, তুমদাম্ ক'রে দরজা-জানালা পড়তে লাগল। গিরিদের যুম ছুটে গেল। অত্যন্ত বিরক্ত হ'রে চোথ খুলেই আকাশের ঐ মূর্ত্তি দেখে ছুটলেন ছাদের সিঁড়ির দিকে—যাবার সময় চিল-চীৎকারে বাড়ী ফাটিয়ে সবাইকে জাগিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁরা মুমের কোলে যে যেমন অবস্থায় ছিলেন, উঠে সেই অবস্থাতেই ছুটলেন ছাতের দিকে—ছোটরাও হুলোড়ের এমন স্থ্যোগ পেয়ে ছুটল তাঁদের পিছু-পিছু।

প্রকৃতির বুকে উঠেছে বঞ্চা আর ছাতে-ছাতে উঠেছে বঞ্চারূপিণীর কাক-চুল উড়ছে, আঁচল উড়ছে, কাপড় উড়ছে, আর্দ্ধ বিবসনা কিন্তু সেদিকে দৃক্পাতও নেই—বড়ের উন্নাদ নর্ত্তনের মাঝে তারা যেন একাকার হ'রে গিয়েছে। আমসন্ত বাঁচাতেই হবে—ছোট চেলেটা কি কারণে আম থাওয়া ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু আমসন্ত পেলে থায়। অমুকে আমচ্র ভালবাসে, তমুকে আম্সি ভালবাসে। মিটি আচার ও জারক লেবুকেও ভালবাসবার লোকের অভাব সংসারে নেই। শুকনো কাপড়-শুলো, বিশেষ ক'রে ছোটদের কাপড় ও কাঁথাগুলি বাঁচাতে না পারলে বিকেলের মধ্যেই সংসারচক্র লাইনচ্যুত হবার সম্ভাবনা – বাঁচা বাঁচা, ভোল ভোল, ছোট ছোট—যাক, সব বেঁচে গেল!

ঐ যা! গুল্গুলো, তোলা হয়নি। সে বেচাররা ছাতের এক কোলে পড়ে ভিজতে লাগল। গুল্ থেতে কেউ ভালবাসে না, তাই ভার কথা কারুরই মনে পড়ল না।

কবি বলেছেন, গ্রীমের 'দিবসা: পরিণামরমণীরা:'। কথাটা সে র্গের কলকাভার লোকদের বাড়ির ছাত সমস্বেও প্রয়োগ করা বেতে পারে-। বিকেল হবার আগে থাকতেই মেরেদের চুল বাঁধবার পালা স্থক হোতো। তার পরে কান্ত-কর্ম সেরে স্থান ক'রে ধোপদোন্ত, একেবারে ঝক্থকে হ'রে তাঁরা ছাতে উঠতেন, ছোট-বড় কেউ বাদ নয়। কুমারী ও বাদের ছেলেপুলে এখনো হয়নি এমন বৌ-রা সাধারণতঃ কাঁচপোকা ব । ধরেরের টিপ পরত। বড়রা টিপ পরতেন না এবং যতদ্র মনে পড়ছে, সিঁদ্রের টিপ পরার রেওয়াজ সে সময় ছিল না।

এ-ছাত ও-ছাত ও সে-ছাতে সশব্দে আলাপচারী স্থক হ'রে গেল।
বাড়ীর ছেলেদের এবং কর্ডাদের উদ্ভাবিত অথবা সংগ্রহ করা যত সব
বাতেলা পল্লবিত হ'রে শাখা বিস্তার করতে লাগল ছাত থেকে ছাতাস্তরে।
বে ছাতে প্রক্ষের কর্ঠস্বর অবধি পৌছয় না—সেই ছাতের সক্তেও সশব্দইসারায় আলাপচারী হ'তে লাগল। বন্টাখানেকের মধ্যেই প্রত্যেকেই
প্রত্যেক বাড়ি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হ'রে গেল—এমন কি ও-বাড়ির
সেজো-বৌরের মেজ ভাজ ক'মান গর্ভবতী সে থবরটি পর্যাস্ত।

এ আডায় বরদের পার্থকা এক রকম উপেক্ষাই করা হোতো।
সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে কর্তারা সব বাড়ি ফিরতে লাগলেন আর
মেরোও একে-একে :ছাত থেকে নেমে পড়তে আরম্ভ করলেন।
ছক্ষকার হওয়ায় সঙ্গে-সঙ্গে ছাত হ'য়ে পড়ল ভোঁ-ভোঁ—ভগু এখানেসেথানে ছ-একথানি অভাগিনী শাড়ী আকুল আবেগে বন্ধন-মোচনের
চেইা করতে লাগল।

ছাতের সঙ্গে আরও কিছু শ্বতি জীবনকে জড়িয়ে আছে, বা না বললে ছাতের প্রতি অরুতজ্ঞতা করা হবে। স্থ-শ্বতি হ'লেও জা অঞ্চনয় স্থ-শ্বতি।

গ্রীম্বকালে বাড়ীর প্রায় সকলেই, মানে বড়রা, রাত্রে ছাতে উতেন। ছোটদের ছাতে শোওয়া বারণ ছিল। ছাতে ততে আমাদের ছই ভাইয়ের প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু ইতিপূর্বেই ছোটদের ছাতে শোওয়ার বিরুদ্ধে বাড়ীতে এমন একট। আবহাওয়া তৈরী হ'য়ে ছিল বে, মনের ইচ্ছাটা সকলের সামনে প্রকাশ করতে সাহসই হোতো না। ছাতে তলে ছোটদের বিছে, সাপ ও নানা প্রকার বিষাক্ত পোকা-মাকড় কামড়াতে পারে, তা ছাড়া ঠাগু লেগে কি না হ'তে পারে!

সংসারে এত ভাল-ভাল জারগা থাকতে ঐ কাঁকড়া-বিছে প্রমুখ সাংঘাতিক জীবগুলি ছাতে বাস করেন কেন এবং দংশনবিলাসের ভাল-ভাল উপকরণ ছাতময় এথানে-সেথানে ছড়িয়ে থাকা সন্থেও বিশেষ ক'রে ছোটদের ওপরে তাঁদের এত আক্রোশের কারণ কি—এ প্রশ্নটা সে সময় খুবই পীড়া দিয়েছিল।

তথাপি একদিন এই বিরুদ্ধ বৃহ ভেদ ক'রে মার কাছে মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ ক'রে ফেলা গেল। কিন্তু মা হাঁ কিয়া না কিছুই না বলার আমাদের সাহস বেড়ে গেল। ছই ভাই, মাকে একলা পেলেই ছাতে শোবার জক্ত বায়না স্থক্ত ক'রে দিলুম। শেষকালে মা-ই আমাদের হ'রে স্থারিশ করার বাবা স্থামাদের ছাতে শোওরা মঞ্র করলেন—কিন্তু দব দিন নর। কেবল মাত্র শনি ও রবিবার রাতে, তবে জামা গারে দিরে শুতে হবে।

শনিবার আমার জীবন-প্রভাতেই মধুবার রূপে দেখা দিরেছিল।

ছাতে শোবার আবেদন মঞ্জুর হওরাতে যে কি রকম খুনী হলুম, তা উল্লেখ করাই বাছলা। প্রার শৈশব থেকেই আমাদের আলাদা বরে শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। নেহাৎ অস্ত্থ-বিস্থুখ না করলে রাতে মাকে কাছে পেতুম না। ছাতে শোওরা হবে, আর মার কাছে শোওয়া হবে, এটা কম খুনীর কথা ছিল না সেদিন।

একটা বড় সতরঞ্চির ওপরে পাশাপাশি তিনটে বালিশ। মধ্যে মা ভারে, ত্-পাশ থেকে আমরা ত্-ভাই তাঁকে একান্ত দখল করেছি। বাবা একটু দ্রে ভারে, আমাদের কণ্ঠস্বরের নাগালের বাইরে—কারণ তাঁর বিছানাটা আমরাই করেছি কি না। আর-আর ত্-চার জন, তাঁরাও দ্রে-দ্রে ভারে আছেন।

ছাতে শুরে আকাশের সঙ্গে প্রথম ধনির্চ পরিচয় হোলো। দীপ্ত ধিপ্রহরে আমসত বা আচার চুরি করতে উঠে কিংবা দিনের বেলায় কখনো সখনো ঘাড় ভূলে বে-আকাশ এত দিন দেখেছি, সে আকাশ আকাশই নয়। চোখের সামনে আলোর আড়াল দিয়ে আকাশ তার আসল রূপ আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিল —আকাশের স্বরূপ প্রকাশ হয় রাত্রে।

কোনো আয়াস নেই, চিং হরে শুরে-শুরে দেখি চাঁদে আর মেঘে লুকোচুরি থেলা চলেছে। নীল পটে হাঝা মেঘ দিয়ে ছবি এঁকে চলেছে বাডাস। কত সম্ভব ও অসম্ভব চিত্রলেখা—কিছুক্ষণ দেখতে-দেখতে আত্মহারা হ'য়ে বেতে হয়। তারাদের কথা ভাবতে-ভাবতে কয়না হাঁপিয়ে পড়ে—এই রহস্তের আবরণ মা একটু-একটু ক'রে মোচন করতেন।

বৈ হাঁদ, ওকে বিরে সাতাশটি তারা আছে, তারা সব চাঁদের
বী—দক্ষ রাজার মেরে তারা। দেবতা হোলেও একদিন ওরা আমাদেরই
মতন পৃথিবীতে বিচরণ করত। চাঁদের বুকে ঐ কলঙ্কের দাগ কেমন ক'রে
হোলো, এম্নি কত কাহিনী—কত যুগ-যুগ আগের লোকেরাও চাঁদকে
ঠিক এম্নিই দেখেছে আজ আমরা বেমনটি দেখ্ছি। এখানে আর ওরা
আসতে পারে না, আমরাও ওখানে যেতে পারি না, তব্ও এইখানকার
কত অল্র ও বেদনার ইতিহাস ওদের সঙ্গে জড়িত হ'রে আছে। ওরা এই
পৃথিবীর লোকের কত কীর্ডিই না দেখেছে। ওরা আমাদেরই আপনার
লোক, আজ অনেক দ্রে চলে গেলে কি হবে, ওদের সঙ্গে আমাদের স্ব
জানে। ঐ বে জিজ্ঞাসার চিক্তের মত তারার দল, ওরাও আমাদের সব
জানে। ঐ বে জিজ্ঞাসার চিক্তের মত তারার দল, ওর নাম সপ্রবি।
বিশিষ্ঠ খবিরা ঐখানে থাকেন। কোন এক রাজার সঙ্গে বিশিষ্ঠের বাধল
ঝগড়া, তার ফলে ত্রিশঙ্কু বেচারা সপরিবারে ঐখানে আটকে আছেন।
কি আর করবেন, ঐখানেই তারা ঘরবাড়ী বানিয়ে নিয়েছেন।

শুনতে-শুনতে রহস্তলোকের অনেক শুপুকণাই আমাদের কাছে প্রকাশ হ'য়ে পড়ত। আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে মনে হোতো—আমাদের সঙ্গে তারারাও বেন গল্প শুনছে। আমরা ওদের কথা শানতে পেরেছি দেখে মিট-মিট ক'রে কৌতুক-ভরাহাসি হেসে আমাদের দিকে চেয়ে থাকে। দোষ ধরা পড়ে গেলে যেমন ধরা পড়বার ভয় আর থাকে না, থাকে মাত্র একটু লজ্জা, তারার দল তেমনি যেন একটু লজ্জিত হ'য়ে পড়ত আমাদের কাছে। একটু পরেই তুই দলে হ'য়ে যেত ভাব, মনের কথা শুরু হ'য়ে যেত।

মা গর বলতেন খুবই আন্তে-আন্তে। গর স্থরু হবার আগেই আমাদের করনা-যোড়া চনমন করতে থাকত ছোটবার জম্ম--গর আরম্ভ হওয়া-মাত্র আসল কাহিনীকে পেছনে কেলে সে গাইলের পর মাইল এগিরে ছুট্ত। প্রারই গল পূরো শোনা হোতো না, ঘুম এসে করত বিশাস্থাতকতা—আজ যে ঘুমের প্রতীক্ষায় সারা-রাত খড়ির দিকে চেমে বসে থাকতে হয়।

এক দিন, সেদিন ভয়ানক গরম। বাড়ীগুদ্ধ সব কোথায় নিময়শে গিয়েছেন। থালি-পারে রাভায় বেকনো-রূপ অক্সায় কার্বের শান্তি-অরুশ সেই নিময়ণ-অর্গ থেকে চ্যুত হ'য়ে-গৃহারণ্যের একতলা তেতলা ক'য়ে বেড়াচিছ। নিয়প্রকৃতি কুলচ্র, আমচ্র প্রভৃতির সন্ধানে ফিরডে থাকলেও, সংসারে আমি একক, আমার কেউ নেই, আমিও কারুর নই, এই রক্ম একটা উচ্চ ভাব মনের মধ্যে লালন ক'য়ে চলেছি বিকেল থেকে! এই ভাবটিকে মনের মধ্যে বেশ জমিয়ে নিয়ে তাড়াভাড়ি আহারাদি সেরে ছাতে চড়া গেল শোকার উদ্দেশ্যে—য়িম ছাতে শোওয়া সেদিন আমার বারণ ছিল।

কিন্ত বেখানে বাবের ভর সেইখানেই সন্ধ্যে হর। বাড়ীতে কেই নেই এই ভরসার বীরদর্পে ছাতে উঠেই চোখে পড়ল, সেখানে বাবা শুরে রয়েছেন। নিঃশব্দ অরিভগতিতে একেবারে উপ্টোম্থ হ'রে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই বাবা আমাকে কাছে ডাকলেন। বাবা বে বে সময়ে ছাতে শুরে আছেন বা তাঁর সেখানে থাকবার সম্ভাবনা আছে, সে কথা আমার কল্পনাতেও ছিল না। যা হোক, উপার নেই, কাছে বেতেই হোলো।

বাবার ভরাল গান্তীর্য, কঠিন শাসন, সামনে পড়লেই পাঠ্যবিষয়ক অপ্রীতিকর প্রান্ন, চরিত্র সংশোধনের জন্ত তন্মিন্ প্রীতি ও তক্ত প্রিয়ক্ষার্য বাধনের উপদেশাবলী—এই সব মাল মশলা মিলিয়ে পিতা-পুত্রেছ মধ্যে একটা ছুর্লজ্বনীয় ব্যবধান রচিত হ'রে উঠেছিল। মোট কথা, তাঁর সারিখ্যে এলে আমরা অভ্যন্ত অক্ষত্তি ভোগ কয়তুম।

কাছে বেতেই বাবা বললেন—এইখানে, আমার পালে শোও

বাক্যব্যর না ক'রে শুরে পড়পুন। একটু বাদেই তিনি আদর ক'রে আমার মাধার হাত বুলোতে আরম্ভ করলেন। বিকেল থেকে 'সংসারে আমার কেউ নেই' এই ভাব মনের মধ্যে পোষণ ক'রে শুতে এসে বাবার এই.আদর—ছই বিপরীত ভাব-তরকের মাঝধানে পড়ে মন-তরী টাল-মাটাল থেতে শুরু করলে।

বাবা বলতে লাগলেন—আজ লারা বিকেলটা ধরে তোমাকে দেখলুম বে ভূমি থালি পারে ঘুরে বেড়াচ্ছ! কেন, তোমার কি চটি নেই ?

- আছে।

—তবে ? এই এক বছরও এখনো হয়নি, পায়ে ট্যাংরা মাছের কাঁটা ফুটে কত দিন কট পেলে! তিন-বার অস্ত্র ক'রে কাঁটা বেক্লল না, শেষে অজ্ঞান ক'রে কাঁটা বের ক্ষরতে হোলো—ভূলে গেছ! সে কট পেলে শুধু ধালি পায়ে ঘোরার অভ্যেসে।

চুপ ক'রে রইলুম। বাবা বলে চল্লেন—শুধু কি তুমিই কট পেলে? তোমার সেই কট দেখে আমি কি কম কট পেয়েছি! তোমার পারে এক-এক বার অন্ত্র করা হয়েছে, আর চিস্তার ও কটে ত্-তিন রাত্রি ধরে আমি ঘুমুতে পারিনি, আপিসেও কাজ করতে পারিনি। তুমি বড় হচ্ছ, এ-সব তোমার বোঝা উচিত।

এমন করুণ ও স্নেহের স্থর বাবার কঠে এর আগে আর শুনিনি
—বাধার প্রাচীর ধূলিসাৎ হ'রে গেল। বাবা বল্লেন—প্রতিজ্ঞা কর
বৈ আজ থেকে আর কথনো ধালি পায়ে ঘোরা-ফেরা করব না।

সেদিনের বাবার দেওয়া দেড় টাকা মূল্যের জুতো কোড়া আজ নিজের পরসার পঁটিশ টাকা দিরে কিনতে হবে এমন ত্রদৃষ্টের কথা তথু আমি কেন, বোধ হর পৃথিবীর কোন বালকেরই কল্পনার আসেনি, তাই প্রতিজ্ঞাটা টপ্ ক'রেই কেলেছিল্ম। সেই কথা মনে হচ্ছে আর ভাৰছি, বাবা এখন থাকলে কি স্থবিষ্টোই না হোতো? জ্তার গাট শেষ ক'রেই তিনি কাজের কথা পাড়লেন—জাচ্ছা এ বে আকাশ দেখছ, এর শেষ কোথায় বল তো ?

বললুম — এর শেষ নেই, আকাশ অসীম।

শৈশব থেকেই অসীম, অনাদি, অনস্ক, অথিল ইত্যাদি কথাগুলো সঙ্গে আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচর ছিল—কথাটা তাল মতন লাগাতে পেরে বেশ খুনী হ'রে উঠলুম।

বাবা আবার প্রান্ন করলেন—আচ্ছা, বল তো, এই আকাশ ে তৈরী করেছে ?

বলসুম-ভগবান।

উপরি-উপরি তত্ত্ববিষ্ণার এই রকম ছ-টি ছন্ধহ প্রশ্নের নিখ্ঁত উত্ত পেরে বাবা দম্ভরমতন উৎসাহিত হ'রে উঠলেন। তিনি আবার প্রঃ করলেন—আছো, ভগবান কোধার থাকেন বল তো ?

খুব ছেলেবেলা থেকে রাত্রে ঘুমোবার আগে এবং সকাল ও সন্ধান্ত থাবার আগে আমরা চোথ বুজে হাত-জ্যোড় ক'রে প্রার্থনা করত্ম খাবার ও শোবার পূর্বের প্রার্থনার ভিন্ন-ভিন্ন বরেৎ বাবাই আমাদের শিথিরেছিলেন। এ ছাড়া, অস্তান্ত কাজ ক'রে শান্তি থেকে অব্যাহিত পাবার জন্ত, না-পড়ে পরীক্ষায় পাশ করার জন্ত, কড়া মাষ্টারের হাত থেকে নিদ্ধৃতি পাবার জন্ত, জাগ্রত অবস্থান্ত প্রার প্রতি মুহুর্ভেই ভগবানের নাম জপ করতে থাকলেও তাঁর বাসস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবার কোত্তলই কথনো হন্তনি—কাজেই এবারকার প্রশ্নে কাংই হলুম।

কিছুক্ষণ উভয় পক্ষই চুপ-চাপ। শেষকালে আমিই উণ্টে প্রশ্ন করলুম—ভগবান কোথায় থাকেন বাবা ?

- তিনি সব জায়গাতে সব সময়েই থাকেন।
- -- ठाँक प्रथा योद्र ना क्न वावा ?

—বারা তাঁকে দেখতে চায় তারা দেখতে পায়। তুমি ধ্ববর গল্প জানো তো ? ধ্বুব তাঁকে দেখবার জন্ত কঠ করেছিলেন—শেবকালে ভগবান তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন।

একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি বল্লেন—সাধু লোককে ভগবান দেখা দেন।

- —আছা বাবা, তাঁকে চিঠি লেখা যায় না?
- -a1 1
- —তিনি কারুকে চিঠি লেখেন ?
- —হাঁা, তিনি আমাদের সকলের জ্বন্তই চিঠি লিখে রেখেছেন— ফুলে, ফলে, গাছের পাতার, কত জারগার তাঁর লেখা ছড়িয়ে রয়েছে— সাধু লোকেরা সে-সব লেখা পড়তে পারেন।

বাবা বলতে সাগলেন—আমরা ঐ বে আকাশ দেখতে গাচ্ছি— ঐ বে তারা-ভরা আকাশ, ওখানেও কত কথা লেখা আছে!

বল্লুম-কৈ, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না বাবা ?

বাবা বল্লেন—মনে কর, আকাশটা যেন একথানা বিরাট স্লেট্— তার ওপরে তিনি জ্যোতির অক্ষরে ঐ সব লেখা লিখে রেখেছেন— কারমনে চেষ্টা করলে বুঝতে পারা যায়, তিনি কি বলছেন।

আমরা বুঝতে পারি না বাবা ?

এবার তিনি নিবিড়ভাবে আমার আদর করতে-করতে ধরা-ধরা গলার বললেন—তুমি যথন বড় হবে বাবা, তথন চেষ্টা কোরো, ঠিক বুরতে পারবে।

বাবা আরও অনেক কথা বলতে লাগলেন, কিছু গে-সব আর আমার কানে গেল না। ঐ কালো শ্লেটে আলোর অক্ষরে চিঠির কথাই কেবল মনের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে গুঞ্জরণ করতে লাগল।

নেই থেকে, সেই স্থদ্র অতীতে, বাদ্যকাদের বিশ্বতপ্রায় এক

রাত্রির অন্ধকারে আকাশের সঙ্গে যে আকর্যণে আমি বাঁধা পড়েছিল্ম, সে বন্ধন আজও অটুট আছে। সারা জীবন ধরে, স্থণ্ডে, তৃংধে, শোকে ও ভোগে সর্ব অবস্থায় আকাশ আমাকে ।টেনেছে তার কাছে—ভোগের অজন্র উপাদানের মধ্যে আত্মহারা হ'রে সমাজ, সংস্কার ও সময়ের থেই হারিয়ে কেলেছি, তারই মধ্যে আহ্বান পাঠিয়েছে আমাকে সেই কালো প্লেটে আঁকা জ্যোতির অক্ষর। উন্মাদনা ঝেড়ে ফেলে ছুটে গিয়ে বসেছি তার নীচে। কত দিন আকাশের দিকে দেখতে-দেখতে মনে হয়েছে, ঐ স্থনীল রহস্তের ধ্বনিকা এইবার বোধ হয় ধ্বে পড়ল— ঐ জ্যোতির ইন্ধিত এতদিনে বৃঝি বা ধরা দেয়! কিন্ধ হায়! বারে বারে আমারই মানসাকাশ আত্ম-অভিমানের মেঘে আচ্ছয় হয়েছে, আর সব ঝাণ্ডা হ'য়ে গিয়েছে।

বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে আকাশের চেরে বড় আকর্ষণ আমার আর নেই।

ৱাতে

আজকাল শহর বড় হয়েছে, লোকজন গাড়ী অনেক বেড়েছে, রান্তায় বেকলে মনে হয় যেন রথের মেলায় চুকে পড়েছি। শহরের অনেক পরিবর্ত্তন হ'লেও বাঙালী-চরিত্রের একটা দিকের পরিবর্ত্তন হয়েছে খুনই কম। অর্থাৎ কাজ-কর্ম সেরে বাড়ী ফিরলে তারা আর গর্ত্ত ছেড়ে বেকতে চায় না। সাধারণতঃ বাঙালীর জীবন তার চাকরী-বাবসা-কাজকর্ম অর্থাৎ অর্থ অন্বেরণ ও সংসার, এই নিয়ে। মুখে য়াই বলুক না কেন, কার্যাতঃ অধিকাংশ লোকই এই গণ্ডির বাইরে পা দিতে চায় না। প্রায় প্রত্যেক বাঙালীই অবাঙালীর সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে পারে না এবং নিজের ক্ষেত্রের বাইরে অন্ত আজ্ঞায় গিয়ে পড়লে সে সঙ্ক্তিত হ'য়ে পড়ে। এই দোষ থেকে আজকাল অনেকে মুক্ত হ'লেও আমি যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ের প্রায় প্রত্যেক বাঙালী সম্বন্ধেই এই কথা বলা যেতে পারত।

श्निमृ মুসলমানে প্রেমভাব বৃদ্ধি পানার তালে-তালে দেখ্ দেখ্ ক'রে শহরে হিন্দুদের মধ্যে লুকি ও মুরগীর প্রভাব আজ বেমন দেখতে পাওয়া যাচ্চে, আগে তা ছিল না।

কাজ-কর্ম সেরে বাড়ী ফিরে হাত-মুথ ধুরে বা স্নান ক'রে অনেকেই একথানি আটহাতি ধূতি পরতেন। চোদ হাত ধূতিতে সজ্জা নিবারণ হর না, এমন সব প্রীক্ষকে বধন সেই আটহাতি ধূতি চড়ত, তথন যে কি বাহার হোতো তা বলাই বাহল্য—গো-হত্যার গন্ধ থাকলেও তার তুলনার লুকিও ঢের সভ্য। এর পরে অবস্থা নির্বিশেষে বার বেমন জুট্ল,

বেমন জনবোগ ক'রে কেউ বা বাড়ীতেই ছেলে ঠেঙাতে বসতেন আর কেউ বা ছঁকো হাতে, কেউ বা খালি হাতেই পাড়াতেই আভ্ডা দিতে বেস্বতেন। এই ছিল সাধারণ লোকের নিয়ম।

পথ জনবিরল হ'রে পড়ার সঙ্গে পথের ত্-ধারে বাড়ীগুলোর রকে
আডা জমাট হোতো। প্রার প্রত্যেক পাড়াতেই এইরকম ত্টো-ভিনটে
রক থাক্ত যেথানে পাড়ার মুরুব্বীরা সন্ধার পর গিয়ে জমতেন—
বে-পাড়া থেকেও কেউ-কেউ আসতেন। বর্ষা ও শীতের দিনে ঘরের মধ্যে
বসা হোতো আর অক্ত সময়ে রকে মাত্র কিংবা শতরঞ্চি পেতে বসা
হোতো, সন্ধ্যে থেকে আরম্ভ ক'রে সেই সাড়ে ন-টার তোপ পড়া পর্যান্ত।

নাড়ে ন-টার তোপ কলকাতাবাসীদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। সাড়ে ন-টার তোপ ছাড়াও সে বুগে ঠিক ঐ সময় পোর্ট কমিশনারের ভোঁ বাজত প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে। অনেকদিন আগেই কলকাতা তার এই সম্পদ ছ-টি হারিয়েছিল, আজ সে নিজম সময়টুকুও হারিয়েছে।

সে বুগে সাড়ে ন-টার তোপ পড়ার সঙ্গে থিয়েটার, সার্কাস প্রভৃতি আরম্ভ হোতো। আবগারী দোকান বন্ধ হোতো (অবশ্রু সামনের দরজা) সাড়ে ন-টার, ছেলেরা পড়া থেকে ত্রাণ পেত, বাব্দের আভ্যা ভাঙত, এ রকম কত কি!

রাতের ফেরিওয়ালার। সব সৌথিন জিনিব নিয়ে বেরুতো—কুলপী বরফ, জামাইতত্ব লেডিকেনি, জুঁয়ের গোড়ে, বেলের মালা এই রকম সব জিনিব। রাতে এক রকম অবাক জলপানওয়ালা আসত, তারা নানা রকম মজার কবিতা আবৃত্তি করত, কেউ কেউ গানও করত। বাব্দের আড্ডায় এদের খুবই পশার ছিল। আধুনিক যুগে অবিখ্যি অবাক জলপানওয়ালারা পায়ে খুম্র বেঁধে নেচে গান গায়—ফেরী করা সম্বন্ধে ভারা অনেক উন্নত পদ্বা অবল্যন করেছে। প্রায় এই সব আন্ডায় নিজেদের মধ্যে আপোষে তকাত কি হ'তেহ'তে এমন ঝগড়া ও গালাগালি স্কন্ধ হোতো যে বাড়ীর-মধ্যেরা সম্রত্ত
হ'য়ে উঠতেন—একটা মারামারি খুনোখুনি হয় বৃঝি! কিন্তু তথখনকার
লোকদের আন্ডার প্রতি এমন নিষ্ঠা ছিল যে, হাজার ঝগড়া হ'লেও
পরদিন সন্ধোবেলায় আবার গুটি-গুটি আন্ডায় গিয়ে বসা চাই। এর
চাইতে অনেক কম ঝগড়াতেও ভাইয়ে-ভাইয়ে ভিয় হ'য়ে যেতে
দেখা যেত।

সেকেলে রাত্রিবেলা বছরূপী বেরুতো নানা রকম সাজে সেজে।
কালীমূর্ত্তি বছরূপীর কথা মনে হ'লে আজও শিউরে উঠতে হয়। লোকটা
গেঞ্জির underwear কালো রংরে ছুপিয়ে পরে হই পায়ে ঘুমুর চড়াতো।
ছু-টো খুব লছা-লছা ফাঁপা টিনের হাতের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মাথায়
কালী ঠাকুরের টিনের মুখোস পরে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে যথন থলখল ক'রে হাসতে আরম্ভ করত, তখন ছোটদের দল, তা যে যতই ওন্তাদ
হোক না কেন, দৌড় দিত অল্বমহলের দিকে।

বহুদ্ধপীদের বেশ থাতিরও ছিল পাড়ার। তারা যে মান্ত্র, অক্ত কোন জীব নয়, এ জ্ঞান টনটনে থাকলেও কি জানি তবুও মনে হোতো তারা ঠিক আমাদের মতন নয়। প্রতিদিন কালী সেজে-সেজে তারা কালী ঠাকুরের অনেকথানি অস্তরঙ্গ হ'রে পড়েছে বলে মনে হোতো। গলায় টিনের নরমুওের মাল। ঝুলছে বুঝতে পারলেও বুদ্ধিকে কল্পনার ধোঁকা লাগাভূম—আসলে ওগুলো সভ্যিকারেরই নরমুগু, তবে মা কালীর প্রভাবে ওগুলো লোকের মনে হয় যেন টিনের। আমরা মনে করভূম, ওরা পুকিরে নরমুগু খার ও নররক্ত পান করে। আমাবভার গভীর রাত্রে কালী ঠাকুর নিজে আসেন ওদের কাছে প্রজা নেবার জন্ত। লোকের বাড়ীর দরজায় এসে দাড়ালে কিছু দিতেই হবে, নইলে শাপ-মন্তি ঝেড়ে দিলে 'একদম্বে গেচিস্' হ'য়ে যাবার সন্তাবনা আছে! ঠাকুর মার্কা বছরূপীদের সম্বন্ধে এই রক্ষ সব অতিপ্রাক্তত ধারণা-গুলোকে কল্পনার বাতাস দিয়ে আমরা খুবই উচ্তে ভূলে রেপেছিল্ম, এমন সময় এক দিনের একটা ঘটনায় সব উড়ে গেল।

এক দিন, সেদিন নিশ্চর শনিবার কিংবা কোন ছুটির দিন ছিল।
নইলে সে সময় পাঠাগার ছেড়ে নীচে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল
না। সন্ধ্যে উৎরে যাবার কিছু পরে আমাদের সদর দরজা খোলা পেরে
ঝন্-ঝন্ আওয়াজ করতে-করতে কালীমূর্ত্তি একেবারে উঠোনে এসে
হাজির হোলো। তার পিছনে রকের আড্ডা থেকে জ্বন কয়েক উঠে
এলেন। ভিড় বাড়ছে দেখে সদর দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া হোলো।

বছরণী থানিকক্ষণ অট্টহাসি হাসলে, তার পর ভর দেথাবার জ্বন্ধ ত্ব-একবার আমাদের দিকে তেড়ে এল। এওকণ চলছিল বেশ কিন্তু হঠাৎ সে মাথার ওপর থেকে সেই দাঁত ও লম্বা জ্বিভ বার-করা প্রকাণ্ড মুখোশটা খুলে ফেল্লে।

এঃ, এ যে একেবারে আমাদের মতনই। এক মুক্কী ভদ্যলোক ভড়াক ভড়াক ক'রে তামাক টেনে চলেছিলেন, বহুদ্ধপী ঝম্-ঝম্ ক'রে সেদিকে এগিয়ে সেই লখা টিনের হাত একেবারে তাঁর নাকের ডগা অবধি বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে—বাবু, কলকেটা দয়া ক'রে একটু দেবেন ?

আচম্কা নাকের ডগায় কালীর হাত দেখে — হোক্ না সে টিনের কালী — কিসে যে কি হয়, তা কে বলতে পারে !—ভদ্রলোক ভড়কে গিয়ে হুঁকো-হাতে তিন পা পিছিয়ে গেলেন।

একটা হাসাহাসি পড়ে গেল। ভদ্রলোক সেদিকে গ্রান্থ না ক'রে এক রকম কাঁপতে-কাঁপতেই হঁকোর মাথা থেকে কল্কেটা ভূলে নিয়ে সেই টিনের হাতের দিকে এগিরে ধর্মেন।

বছরূপী টপ্-টপ্ ক'রে ত্-হাতের খোলোশ খুলে মাটিতে নামিরে

রেখে কলকেটা নিয়ে উবু হ'য়ে বসে দশ আঙুল দিয়ে সেটাকে সাপটে ধরে ফক-ফক ক'রে টানতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

আর এক জন, তাঁরও হাতে থেলো হঁকো, জিজ্ঞানা করলেন— তোমার দেশ কোথায় গা ?

বছরূপী সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে কলকেট। নামিরে ধরে আগুনে খুব জোরে ফুঁ দিতে লাগল। তার পরে আবার গোটা কয়েক টান মেরে বল্লে—নাঃ, এতে কিছু নেই—নিন্ ঠাকুর, আপনার কল্কে—

বলা বাহুল্য, ভদ্রলোক থালি গায়েই এসেছিলেন। তথনকার দিনে মধ্যবিত্তের ঘরে দিবা-রাত্রি জামা টন্কে থাকবার রেওয়াজ ছিল না। গ্রীমের দিনে বাড়ীতে তো বটেই, পাড়ায় বেক্লতে হ'লেও লোকে থালি গায়েই বেক্লত।

ভত্তলোক নিজের ছ'কোর মাথায় কলকেটা বসাচ্ছেন এমন সময় বহুদ্ধণী বল্লে—সাধে কি আর বলে—বামুন-চোধা কল্কে!

কথাটা শুনে সভার একেবারে হর্রা উঠে গেল। মেয়ের। ছিলেন আড়ালে দাঁড়িয়ে, দেখান থেকেও চাপা হাসির ত্-চারটে টুক্রো ছিট্কে এল। ভদ্রলোক বিলক্ষণ চটে গিয়ে কি প্যাচে বছরূপীকে কাৎ করা যায়, শুমু হ'য়ে তাই ভাবতে লাগলেন।

বছরণী কিন্তু নির্বিকার হ'য়ে অস্ত দিকে ফিরে যে ভদ্রলোক তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁকে বল্পে—দিন বাবু আপনার কল্কেটা।

ভদ্রলোক কলকেট। তুলে তার হাতে দিতেই সে আবার সেই রকম উবু হ'রে বসে সঁহি-সঁহি ক'রে দম লাগাতে লাগল—সভা হ'রে গেল একেবারে নিজন। আমরা ছেলে-বুড়ো সবাই হাঁ ক'রে তার কল্কে-টানা দেখতে লাগলুম, সকলেই আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক। করতে লাগলুম—এবার কি হর! মিনিটখানেক বাদে কৃদকেটা নামিরে মুখের সাম্নেকার মেদ তাড়াতে-তাড়াতে বছরূপী বললে—হাঁা বাবু, পিজ্ঞাসা করছিলেন দেশ কোথায় ? দেশ আমাদের নদে জেলায়।

আগেকার ভদ্রলোক তওক্ষণে সামলে উঠে বছরূপীকে বোধছর একেবারে পেড়ে কেলবার জন্ম জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা কি জাত হে? যার কল্কে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বছরূপী বিনীতভাবে তাঁকে বললে— আজে, আমরা জাতে ছতোর।

ভদ্রলোক বেশ উৎফুল হ'য়ে আবার একটি ব্রহ্মান্ত ছাড়লেন—তা বাপু, ছতোরের ছেলে হ'য়ে জাত-ব্যবসা ছেড়ে এ উপ্পর্যন্তি করছ কেন ?

বছরূপী বেশ বিজ্ঞের মতন জবাব দিলে—জাত-ব্যবসা ছাড়া জ্ঞ করি করা বদি উপ্তবৃত্তি হয়, তা হ'লে তো ঠগ বাছতে গাঁ ওজাড় হয়ে যাবে ঠাকুর। আপনি বাস্থা, আপনি কি জাত-ব্যবসা করেন, না উপ্তবৃত্তিই ক'রে থাকেন আমার বতন ?

সেধানে আরও ত্-চার জন ব্রাহ্মণ ছিলেন, কথাটা তাঁরা রক্ষক্ষেপ গ্রহণ করতে পারলেন না। কেউ-কেউ ত্-একটা মন্তব্যও ছাড়তে লাগলেন। একজন বললেন—বলি ওংচ, কথা তো খুব বলতে পার দেখচি, গান-টান গাইতে পার ?

বছরূপী একেবারে বিনরের অবতার হ'রে বললে —একটু-আঘটু পারি বৈ কি । পরসা পেলেই গাই।

গানের হকুম হোলো। বছরূপী একটু যুদ্ধ-যুদ্ধ আওয়াজ ক'রে গলা ভেঁজে নিমে গান ধরূপে—'আশান ভালবাসিদ্ বলে আশান করেছি ছদি।'

পুরানো গান কিছ বছরপী ছিল ক্ষক প্র নানটা ভাবের সলে ছ-তিন বার গেরে-গেরে সে থাম্ল। অত্যন্ত কঠকর আবহাওয়ার মধ্যে যেন মেঘবর্ষণ হোলো। তার বাক্যবালে বারা রাগ করেছিলেন তাদের উয়। কেটে গেল। ছ-এক জনের চকু লোক-দেখানো জলে ভরে উঠল। পাড়ার জন-হয়েক নামজাদা কালীভক্ত পূজোর দেরী হ'রে বাচ্ছে দেখে বেরিয়ে পড়বার জন্ত ছটফট করতে আরম্ভ করলেন, ইতিমধ্যে আবার গানের করমাশ স্থক হোলো।

এক জন রসিকতা করলেন—হাাঁ হে, নাচতে পার ? বহুরূপী হাত জোড় ক'রে বললে—আজ্ঞে না।

আর এক জন বললেন—নাচ না হে, লজ্জা কি! পায়ে খুম্র বেঁখেছ আর নাচতে জান না ? একি একট। কথা হোলো!

বছরূপী আবার সেই রক্ষ হাতজ্ঞাড় ক'রে বললে—আজে, স্থামি নিজের ইচ্ছায় নাচি না—তবে আপনারা যখন বলছেন তখন নাচতেই হবে! বিদায়ের সময় ভূলবেন না।

সকলে মিলে বহুদ্ধপীকে উৎসাহ দিতে লাগলেন—নাচো, নাচো— কোন ভয় নেই।

সবার কথার বছরূপী তার নাচ স্থক করলে।

বাপ্রে, সে কি নাচ! কি লক্ষ কি ঝক্ষ! বাড়ীর ও বাইরের মত লোক ছিল সেধানে—ছেলে-বুড়ো কারুর মুখে আর বাক্যি নেই! আর সে নাচের কি শেব আছে! থেকে-থেকে ভীবণ হুকার হেড়ে মাটি ছেড়ে হাত-ছরেক পুত্তে লাফিরে উঠে এক পারে হাঁটু গেড়ে বসা, খাঁড়া দিয়ে অহুর বধ করা, যুদ্ধ করা, অহুর ধরে-ধরে থাওয়া—দেখতে দেখতে আমরা হাঁপিরে উঠতে লাগলুম আর মনে হৈতে লাগল, ধরে না থামালে বোধ হয় আমাদের জীবনভার এই রকম দাঁড়িরে নাচই দেখতে হবে।

প্রার ঘণ্টাথানেক ধরে এই রকম নেচে বছরূপী এলিরে গড়ল। বা হোক, নাচ শেব হোলো, সকলে চুপচাপ, এ-ওর মুধ চাওরা-চাওরি করছে, এমন সময় বছরূপীই বললে—বাবু, এবার আমার

विशाय छान ।

সকলের টনক নড়ল, বছরূপী বেশ কিছু হাতিরে নিয়ে জাবার আসবার ভয় দেখিয়ে চলে গেল।

বছরূপী চলে বেতেই তার নাচ সম্বন্ধে আলোচনা স্থর্ন্ন হ'রে গেল। কেউ বললে—ব্যাটা আমাদের খুব বোকা বানিয়ে দিয়ে গেল।

কেউ বললে—বাপের জন্মে এমন নাচ দেখিনি।

বৃদ্ধ অকুরবাব এক জরগায় বলে বিমোচ্ছিলেন, এক জন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—অকুরদা কি বলেন ?

অক্রবাব ছিলেন অন্তত চরিত্রের লোক। দিন-রাত্রি তিনি আফিংরের মৌজে ভোমৃ হ'রে থাকতেন—বিশেষ ক'রে সন্ধ্যার পর তিনি আর চোথ চাইতেন না। আশ্চর্ব্যের বিষয় এই যে, সেই চোখ-বন্ধ অবস্থাতেই তিনি পাড়াময় বুরে বেড়াতেন। তাঁর আর একটি আশ্চর্যা গুণ ছিল, তিনি চলতে-চলতে, বাজার করতে-করতে, কথা ৰলতে-ংলতে ঘুমিয়ে পড়তে পারতেন। আমরা দেখেছি, অকুরবাবু মুদীর দোকান থেকে সওদা ক'রে ঠোঙা কিংবা বিষের বাটি হাতে নিয়ে ৰাড়ী ফেরবার পথে রান্ডার দাঁড়িয়ে দিব্যি ঘুম লাগাচ্ছেন। পাডার ছোট-বড় সবার বাড়ীতেই আনন্দ-উৎসব, স্থধ-তঃধ-শোচকুর সময় অক্রর বাবু বেতেন আর গিয়েই লাগাতেন ঘুম। সন্ধার পর পাড়ার বত আড্ডা ও লোকের বাড়ী ঘুমিয়ে বেড়ানই ছিল তাঁর কাস্ত। অথচ তিনি হ:ধ করতেন, বিছানায় বালিশ মাথায় দিয়ে সুধে ঘুম তাঁর হয় না, সারারাত্তি জেগেই কাটাতে হয়। স্বার ওপরে অকুরবাবু ছিলেন সবজান্তা। দিবানিশি ঘুমিয়ে এত জ্ঞান তিনি সংগ্রহ করলেন কি ক'রে, তা পাড়ার সবার একটা গবেষণার वियन्न छिन ।

এ-হেন অজুরবার এক পাশে বসেছিলেন অর্থাৎ বুমুচ্ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করার তিনি চোধ বুলেই বললেন—না হে, ওকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, এর মধ্যে জিনিস আছে। একেবলে তাণ্ডব নাচ।

স্বার বেন একটা হদিশ গেল। তাগুব সহদ্ধে আলোচনা স্থক হ'রে গেল। সে সহদ্ধে বার যা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তা আউড়ে বেতে লাগলেন। এক জন বেশ ফলাও ক'রে বললেন—আরে বাবা, আসল তাগুব কি দেখতে পারা যায়! স্বার চোখ তা সহ্থ করতে পারে না। অনেক সাধনা করলে তবে সে নাচ দেখবার শক্তি হয়। স্বার চোখে স্ব নাচ সহ্থ হয় না!

জেনেই হোক আর না জেনেই হোক, ভন্তলোক সেদিন একটা মহা সভ্যই প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, কারণ নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি যে, অনেক নাচই আমার চোথে অভাধ্য বলে মনে হয়েছে কিন্ত অন্তে তা উচ্ছসিত প্রশংসা করেছে। এই বৈষম্যের কারণ বা ভনেছি, তা এক কথার প্রকাশ করতে গোলে ঐ কথাই বলতে হর—সে নাচ বোঝবার মতন শক্তি আমার নেই।

আর এক জন ভর্জলাক বললেন—থিয়েটারের নাচ কি আবার নাচ
না কি? আসল নাচ হচ্ছে এই, তবে ব্যাটা ঠিক মত নাচতে পারলে না?
বাল্যাবস্থায় একবার থিয়েটার দেখেছিলুম। জীবনে সেই প্রথম
দেখলুম নাচ। পরীর মত দেখতে স্থীদের সেই চক্কর মেরে নাচ—
ওঃ, সে যে কি ভালোই লেগেছিল, কি বলব! ভবিষ্যতে নৃত্যকলাটকে
বিশেষভাবে আয়ত্ত করতে হবে, এমন বাসনাও মনের মধ্যে জাগ্রত ছিল
এবং থিয়েটারের সেই নাচই ছিল আমর্শ। কিন্তু সেদিন যখন শুনলুম,
থিয়েটারের সেই নাচ নাচ-নামেরই যোগ্য নয় এবং এই তিড়িং-মারাই
হচ্ছে আসল নাচ, সেদিন বিচলিতই হয়েছিলুম। যাই হোক, সেই
রাত্রেই বিছানায় শুরে সংকল্প করা গেল—কৃচ পরোয়া নেই, ঐ
তিড়িংমারা নাচই শিথতে হবে।

কিন্ত বিধাতা বাকে প্রতিভা দেন অথচ সেই অমুপাতে অর্থামূক্ল্য করেন না, সে ঘূর্তাগার ছনিয়ার ছুর্গতির আর সীমা থাকে না। তাই নাচ না শিখেও সারাজীন ধরে নেচেই বেড়াতে হোলো—কখনো তাগুব, কথনো কথক, কথনো বা কথাকলি তবে—সেই বছরূপীরই মতন নিজের ইচ্ছার নয়, পরের কথার।

मूर्णिक्ल वाष्णाव

একদিন মার কাছে মুশকিল-আশানের নামটা তনলুম। মুশকিল আশান কথাটার মধ্যে কেমন-যেন একটা চমক আছে। মুশকিল আশান দেবতার নাম! সেই দেবতাকে যারা পূজো করে, সেই সব সম্প্রেসীরা রাজি-বেলা বের হয়—লোকের কাছে মুশকিল-আশানের নাম শোনাতে। লোকের কাছে তারাও মুশকিল-আশান বলে পরিচিত। এ-পাড়াতেও একজন মুশকিল-আশান আসে মাঝে-মাঝে অনেক রাতে। সে না কি আবার সবার বাড়ীতে যায়না! মাঝে-মাঝে আমাদের বাড়ীতে এসে মুশকিল-আশানের নাম তনিয়ে যায়, আমরা তথম ঘুনিয়ে থাকি।

আনেক রাতে, রান্ডার লোক-জন চলা যথন একেবারে বন্ধ হ'য়ে যার, সেই নিশুভিতে অন্ধকার অলি-গলিতে বাতি হাতে নিয়ে লোকের দরজার দাঁড়িয়ে মুশকিল-আশানের নাম করে—বিপদকে তারা ডরার না, কারণ তারা মুশকিল-আশানের পুজারী।

মার কাছে আরও গুনে অবকে হ'রে গেলুম যে, এই মুশকিল আশানেরা হিন্দু নর, তারা মুসলমান সন্ন্যাসী অর্থাৎ কবির। তারা মাধার লখা চুল রাথে বটে কিন্তু জটা করে না। হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতন তারা লাঙট পরে না, তারা পরে আলখারার মতন একটা জিনিব, যাকে ওরা কফ্নি বলে।

মার মুখে ভনে মুশকিল-আশানের একটা ছবি মনের মধ্যে স্টে উঠতে লাগল, সলে-সলে তাকে দেখবার ইচ্ছাও প্রবল হ'তে লাগল।

, y. কিন্তু সে কি ক'রে সম্ভব হবে—সে আসে অনেক রাজে, এদিকে সাড়ে নটা বাক্তে না বাক্তে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি বে!

আর এক দিন মার কাছে শুনলুম—কাল রাতে মুশকিল-আশান এসেছিল, আস্চে শুক্রবারে আবার আস্বে, বলে রেখেছি তাকে ভোদের দেখাব।

অনেক কটে আশার শুক্রবার এদে পৌছল। সে রাত্রে আমরা মার কাছে শুসুম। অনেক রাতে, অর্থাৎ তথন আমরা অংলারে সুমুচ্ছি, মা ডেকে তুলে বল্লেন—চল, মুশকিল-আশান এসেছে।

মার হাতে একটা স্থারিকেন লঠন, আমরা ঘুমের বোরে টলতে-টলতে চললুম তাঁর পেছনে-পেছনে—রাত ত্পুরে বাড়ীর সব স্বায়গাগুলোই বেন অপরিচিতের মতন ব্যবহার করে, তাই ত্-একটা ঠোকরও থেতে হল। ত্-টো উচ্-নীচু ছাত, সি"ড়ি, তুটো উঠোন পেরিয়ে আমাদের এক স্বায়গায় দাঁড় করিয়ে এগিয়ে গিয়ে মা সদর দরস্বার হড়কো খুলে দিলেন।

প্রথমেই বাড়ীর মধ্যে চুক্ল ধানিকটা ধেঁায়া। তার পেছনে অভ্ত পোষাক-পরা, অভ্ত প্রদীপ হাতে নিয়ে চুক্ল এক অভ্ত চেহারার মাহব !

আমাদের হুই ভাইকে সামনে রেথে মা পিছনে এসে দাঁড়ালেন।
মুশকিল-আশান এক-পা ক'রে এগিরে একেবারে আমাদের সামনে
এসে দাঁড়াল—আমরাও সেই তালে পেছোতে-পেছোতে একেবারে মার
গা-সাঁট্রা হ'রে গেলুম।

সম্ভ্রম, বিস্ময় ও ভয়-মিশ্রিত এক বিচিত্র পুলকে আমরা দেখতে লাগলুম সেই মুশকিল-আশানকে।

মাথার তার লখা বাবরী, বেশ পরিপাটি ক'লা আঁচড়ানো। মুখে যেমন লখা তেমনি খন কাঁচা-পাকা দাড়ি—চোথ ছ-টো ছাড়া মুখের আর কিছুই দেখা যার না। নাকের ওপরেও ইয়া লখা-লখা রোঁরা জিঞাসার চিলের সতন উভত হ'বে ররেছে। অলে একটা সরলা আলখারা হাঁটু ছাড়িরা একটু নেমছে, পারের বাকী অংশটা নয়। আলখারার পারে বছ-বড় করেকটা রঙিন কাপড়ের তালি! গলার বড়-বড় শাদা ও নীল পুঁতির লখা মালা ঝুলেছে, সেই রকমই আর একগাছা মালা বা-হাভের কব্জীতে ঝুলছে। ডান হাতে অভ্ত এক দীপ—যেন ছোট একখানা কাঁসিতে বড় একটা ঘট উপুড় করা। তা থেকে বদ্নার মতন ছ্-টো নল ছ-দিক দিরে বেরিরেছে, তার একটাতে ইয়া মোটা পলতে অলছে দাউ-দাউ ক'রে। করেক মুহুর্তের মধ্যেই খোলা উঠোন ধোঁয়া ও কেরাসিনের গন্ধে ভরপুর হ'রে গেল। কাঁসার খালি স্থানটুকুতে তেল-কালি ও পয়সা মাখামাখি হ'রে পড়ে আছে।

বিশার-বিমৃত হ'রে সেই মৃর্জির দিকে চেরে আছি, এমন সমর আমাদের চম্কে দিয়ে মৃশকিল আশান হার ক'রে চীৎকার ক'রে উঠল—ইহা পীর মৃশকিল-আশান—বাঁহা মৃশকিল তাঁহাই আশান। তারপরে গড়-গড় ক'রে আরও কতকগুলো কি আউড়ে গেল বুঝতে পারলুম না।

মা তাকে বল্লেন—বাবা, আমার এই ছেলে ছ-টো বড় ছরস্ত— মুশকিল-আশানের কাছে একটু মিনতি কোরো এদের জল্ঞ।

মুশকিল-আশান আমাদের দিকে পূর্ব-দৃষ্টিতে একবার চাইলে। বুকের মধ্যে গুর্-গুর্ করতে আরম্ভ করল। তারপর চোথ ত্-টো আকাশমুখো ক'রে কি বেন দেখতে লাগল। সলে-সলে আমাদের চোথও উঠল ওপর দিকে, কিন্তু সেধানে ফাঁকা আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলুম না।

প্রার আধ মিনিট কাল সেই উৎকণ্ঠার কাটবার পর মুশকিল-আশান শুব মিটি হ্রুরে বল্লে—না, ছেলে-পুলে একটু হুঠু-হুরস্ত হ'রেই থাকে— সব ঠিক হ'বে থাবে, কিছু ভাববেন না।

ৰা বশ্লেন—সে রক্ষ নয়, তা হোলে আর ভাবনা কিসের! এই বলে আমাকে দেখিয়া দিয়ে বশ্লেন—এই ছেলেটা এরি মধ্যে একবার তেতলার ছাত থেকে পড়েছে আর একবার জলে ডুবেছে—এখনো তো সারা জীবনই পড়ে আছে।

এই অবধি বলে আমার ছোট ভাইকে দেখিয়ে আবার বল্লেন— এটা ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু এটাকেও ছড়িয়ে নিমে বেডায়।

এ হেন চিজটিকে মুশকিল-জাশান মশার বেগ কিছুকণ ধরে নিরীকণ করতে জাগলেন।

কিছুক্সণ চুপচাপ কাটবার পর মা বল্লেন — এদের জন্তে দিনে-রাতে শাস্তি পাট নে বাবা।

মান্তকণ্ঠের সেই কাতর আকুলতা দেবতাকে স্পর্শ করেছিল কিনা জানি না, কিন্ত শিশু-হাদর স্পর্শ করেছিল। তথুনি সংকর ক'রে ফেললুম— মার মনে কষ্ট দোবো না—মারের অবাধ্য হব না।

এই সংকর জীবনে অসংখ্যবার করেছি এবং অসংখ্যবারই সংকরচ্যুত হয়েছি।

মুশকিল-আশান আখাস দিয়ে বললে—কিছু ভাববেন না, সব ঠিক হ'য়ে যাবে মা। মুশকিল আশান ভালই করবেন।

মা আঁচলের গেরো খুলে আমাদের ছই ভাইয়ের হাতে একটা ক'রে পরসা দিলেন। আমরা তার সেই তেল-কালি-মাথানো কাঁসিতে পরসা ছ-টো কেলে দিতেই মুশকিল-আশান আবার চেঁচিয়ে উঠল—ইয়া পীর—

তারপরে একটু তেল কালি তুলে আমানের কপালে একটা ক'রে টিপ লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল।

মার সঙ্গে ঘরে ফিরে এসে তাঁর পাশেই শুরে পড়লুম। দিনান্তের পারে দাঁড়িরে আন্ধ মনে হচ্ছে, সেদিনটা আমার শুভই ছিল। জীবন্ত সুশকিল-আশানের পাশে শুরে দ্রাগত মুশকিল-আশানের জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে ঘূমিরে পড়েছিলুম—এমন দিন জীবনে কমই এসেছে। মুশকিল-আশানকে আমি ভূলিনি, আর সে-ও আমার ভোলেনি।
মুশকিল-মহাসমুদ্রের উত্তাল তরজ ভেদ ক'রে আমার কানে এসে পৌচেছে
তার অভর বাণী—বাঁহা মুশকিল তাঁহাই আশান।

জীবন-পথে কত মুশকিলেরই না দেখা পেলুম—মুশকিলের মক্তৃমি
সরীচিকা ও চোরাবালি, মুশকিলের হাড়িকাঠ, কড়িকাঠ, ঝাড়া, ছোরা
ছুরি—কত মনোহররূপে, কত বীভংগরূপে এসেছে তারা! সব কাটতে
কাটতে আজ মুশকিলের সিংহলারের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি।
ভরসা আছে, যথাসময়ে কানে এসে পৌছবে মুশকিল-আশানের সেই অভর
বাণী—কোন ভয় নাই—বাহা মুশকিল তাঁহাই আশান!

পথে

এক দিন স্থলের ছুটি হবার সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ্টি নামল মুবলধারায়---

ইন্ধুল থেকে: বেরুতেই পারলুম না। পেটে ছর্দম ক্ষুধা এবং আকাশের কর্ণভিদ্ গর্জন ফাঁকা ক্লাসে বসে পরিপাক করবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

ঘণ্টাদেড়েক দারুণ বর্ষণের পর প্রকৃতি শাস্ত হলেন। বেরিয়ে পড়লুম ছই ভাইয়ে—ইস্কুল থেকে বাড়ী আনেক দ্রে, পড়ি ডক্ সাহেবের ইস্কুলে।

সেকালে কলকাতার ঘণ্টাথানেক বেড়ে বৃষ্টি হ'লে— যিনি বেথানে তাঁকে সেইথানেই থাকতে হোতো হ-তিন ঘণ্টার জন্ত। প্রায় সব রাস্তাতেই জল দাঁড়াত। ইস্কলের ছোট ছেলেদের ভূব-জল, বুক-জল, — হাঁটু-জল ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ছিল না। থাটা-পায়থানার যত ময়লা ভাসত সেই জলে আর তারই ওপরে দাপাদাপি ও লাকালাফি করতে করতে ছাত্রদল বাড়ী ফিরত। এমন দিনে বাড়ীতে কিরে আমাদের সাবান দিয়ে শান করতে হোতো।

বে সব রাস্তায় জল দাঁড়াত না অথবা বেশী দাঁড়াত না, সে সব রাস্তায় হোতো কাদা—সে এক রকম চট্চটে ঘন এবং সাংঘাতিক-রকমের পেছল কাদা, শতকরা পাঁচিশ জন পণিককে আছাড় থেতেই হোতো। এই পা পিছলে পড়ে গিয়ে কর্দমাক্ত হওয়াটাকে ছেলেদের: ভাষার বলা হোতো—আলুর দম হওয়া। কতদিন যে আলুর দম-হ'য়ে বাডী ফিরেছি তার আর ঠিকানা নেই। বর্ধাকালে অলও দাড়ার না, কাদাও হর না এমন রান্তা সে সমরের শহর-রক্ষকেরা দেশী পাড়ার রাধা বোধহর পছন্দ করত্তেন না। এ যুগেও এ সহন্ধে তাঁদের মতামতের কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে বলে তোলনে হর না।

বাই হোক, বই, ছাতা, জুতো, কাঁচা-কোঁচা সামলাতে-সামলাতে অর্থাৎ ত্-হাতে দশ হাতের কেরামতি করতে-করতে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় দেখতে পেলুম ফুটপাথের ওপরে থানিকটা ডাঙা জায়গায় বেশ একটা ভিড় গোল হ'য়ে দাড়িয়েছে—তাদের আকর্ষণের কেন্দ্র-বস্তুটিও বে নেহাৎ মামুলী নয় তা ভিড়ের হালচাল দেখে বাইরে থেকেই ব্যুতে পারা যায়।

সেদিন ক্ষ্মার টান ছিল প্রবল, তাই মজা দেখবার প্রলোভন উপেক্ষা ক'রেই এগিয়ে চল্লুম; এমন সময় ভিড় থেকে হো-হো হাসির হন্না ভনতে পাওয়া গেল—ছুটলুম সেদিকে। জুতো, ছাতা, বই সমেত কোনো রকমে এঁকে-বেঁকে ভিড় ঠেলে ভেতরে চুকে গিয়ে দেখতে পেলুম—পাগলিনী!

রান্তার পাগলী বলতে লোকের মনে যে ছবি জাগে এ সে রকম
নয়। প্রথম দৃষ্টিতেই ব্ঝতে পারা যায়, রান্তার সলে তার পরিচয়
সবে-মাত্র স্থক হয়েছে। পাগলিনীর মাথা কক্ষ নয়, দিব্যি পরিপাটি
ক'রে আচ্ডানো, তেল-চক্চকে এলানো চুল—সীঁথেয় ঝক্ ঝক্ করছে
সিঁদ্র, কানে ও হাতে সোনার গয়না। অলে চওড়া কালা-পেড়ে পাতলা
শাড়ী, একেবারে ধোপদোল্ড, বেশ বাগিয়ে পয়া। স্থলকায়া হ'লেও
দেখতে ধারাপ নয়। চেহারার মধ্যে একটা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত ফুটে
বেক্লছে, বয়স তার পঁচিশ-ছাবিবশের বেশী হবে না।

দেখনুম, পাগদিনী নিঃশব্দে কাঁদছে আর ভিড়ের লোকেরা ভিচ্নরবে হাসছে। ভিড় থেকে এক জন লোক জিজাসা করলে—ভামবাবৃকে এত ভালবাসিস তো তাকে ছাড়লি কেন ?

পাগালনী কাঁদতে-কাঁদতে বললে—তাড়িয়ে দিলে বে!

ইতিমধ্যে আর একজন বললে—তোর খ্রামবাব্ আগেকার বাড়ী ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

—কোপায় গিয়েছে। কত নম্বরের বাড়ী ?

লোকটা যা-তা একটা ঠিকানা বলে দিলে। পাগলী বার ছ-তিন তা আওড়ে নিয়ে জিজ্ঞানা করতে লাগল—কত দ্র, কোন রান্তা দিয়ে গেলে পৌছতে পারব সেই ঠিকানায় ?

একজন রসিকতা ক'রে বললেন—তোকে সেধানে যেতে হবে কেন? স্থামবার বলেছে, সে নিজে এসে তোকে নিমে যাবে এথান থেকে।

গাগলিনীর মুখে হাসি ফুটল। খুশীতে ভরপূর হ'রে সে জিজ্ঞাস। করলে—সত্যি বলেছে! তোকে বলেছে! তাকে নিম্নে এলি না কেন ? লোকটা বললে—চতুর্দোলা ভাড়া করবে, ব্যাগু ভাড়া করবে তবে তোজাসবে। তোকে তো আর এমনি নিম্নে যেতে পারে না ?

চারদিকের সবাই হেসে উঠল—পাগলিনী আবার কাঁদতে শুরু ক'রে দিলে।

ভিড়ের লোকের। পাগলিনী সহদ্ধে নানা রক্ষ কথা বলতে লাগল। কেউ বললে,—ও ভদ্র গৃহস্থের মেরে, স্থামবাবু বলে একটা লোক ওকে বের ক'রে নিয়ে এসে কিছু দিন বাদে ফেলে পালিরেছে, তাইতে ওর মাথা খারাপ হ'রে গেছে।

আর একজন ∮বললে—ভত্তবরের মেরে নর—ভবে খামবাব্র জন্মই ও পাগল হরেছে।

পাগদিনীকে দেখে মনের মধ্যে করুণার উত্তেক হরেছিল কিছ ছার জীবনকাহিনী করুণতর বলে মনে হোলো। সেই রাত্রে থাবার সময় স্বার সামনে পাগলিনীর গল্প করলুম। দেখলুম আসরের স্বাই গন্ধীর হ'রে পড়লেন—ত্ত্একজন স্হায়ভূতি-স্চক একটু শল উচ্চারণ করলেন মাত্র।

কিন্ত কিছুক্ষণ যেতে না যেতে সকলেই মুখ খুল্ল। একজন শেষ রায় দিয়ে দিলেন—ও মেয়েগুলোর শেষকালে এ-ই হ'য়ে থাকে।

ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারলুম না। আমার তো এতক্ষণ মনে হচ্ছিল ভামবাবু লোকটাই ধারাপ। নেই বা হোলো লৈ ভদ্র গৃহস্থবের কক্স। কিন্তু ভালো সে বেসেছিল একজনকে, যার জন্ত আজ পাগলিনী হ'য়ে রান্ডায় কেঁদে-কেঁদে বেড়াচ্ছে—এত বড় সত্যটাকে এরা ত্-টো চুক্চুক্ আওয়াজ ক'রে রায় দিয়ে দিলে, যত দোষ ঐ মেয়েটার!

কিন্ত মাছযের চিত্তলোক, যেখানে নিয়ত স্থান্ট ও ধ্বংসের কাজ চলেছে, সেই আমার চিত্তলোকে পাগলিনীর জন্ত নতুন মহল তৈরি হ'তে ক্ষক্র হোলো।

পাগলিনীকে ইস্কল-বাতায়াতের পথে রোজই দেখি। প্রায় রোজই তাকে একই জায়গার দেখতে পাওয়া বেত। দেখতুন, রাজ্যের ছোট ছেলে এবং সকল বয়সী স্ত্রী-পূরুষ তাকে সর্বদাই বিরে রয়েছে, তার আকুলতা দেখে হাসাহাসি করছে। ছেলেরা বলছে—ঐ দেখ, ঐ দ্রে তোর ভামবার পালিরে বাচ্ছে।

পাগলী উঠে থপ্-থপ্ ক'রে দৌড়ল সেই কাল্লনিক শ্রামবাব্র উদ্দেশ্তে—কিছু দ্র গিরে শ্রামবাব্কে দেখতে না পেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে ফিরে এল! তার ব্যর্থতা দেখে স্বাই হেসে উঠল।

এক দিন ইকুলে বাবার সময় দেখি পাগলিনীকে দিরে অনেক লোক দাঁড়িয়েছে। ছ্-এক জন ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে চেঁচানেচি করছেন। একজন বললেন—এ সব লোককে পুলিশে দেওয়া উচিত। ভাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে চুকে দেখি, পাগলিনী ফুটপাথের থারে বসে নিঃশব্দে কাঁদছে! তার কপালের থানিকটা বেশ কেটে গিয়েছে, ছ-তিন জন লোক মিলে দমকল থেকে আঁজলা ক'রে জল এনে তার ক্ষতস্থান ধুয়ে দিছে।

শুনলুম, সেদিন সকাল থেকেই পাগলিনী খামবার, খামবারু ক'রে চেঁচিয়ে পাড়া একেবারে মাথায় ক'রে ভূলেছিল। একটা লোক তাকে বলে যে, খামবারু বলে এখানে চেঁচালে কি হবে, সে তো ঐও পাড়ায় থাকে।

আর যার কোথার! সংবাদটি শুনেই পাগলী উঠে দৌড় মেরেছিল সেই ও-পাড়ার দিকে। স্থল শরীর, কয়েক পা থেতে না থেতে পা পিছলে পড়ে গিয়ে কপাল কেটে গেছে। নিঃস্বার্থভাবে সকলে যখন সেই নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগে আত্মহারা, তখন জনকয়েক সহাদর লোক এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করেন।

কিছুদিনের মধ্যেই পাগলিনীর নামকরণ হ'রে গেল। ভামবাব্-পাগলী বললেই ও-পাড়ার ছেলে-বুড়ো সকলেই বুঝতে পারত কার নাম করা হচ্ছে।

বছর-দেড়েক পরে আমরা ও-পাড়ার ইস্কুল ছেড়ে দিল্ম। স্থামবার্ পাগলীর কথা প্রায় ভূলেই গিয়েছিল্ম, এমন সময় এক দিন দেখি, পাগলিনী হেদোর ধারে বেশ একটি জনতার মধ্যে বসে তার সেই স্নাতন স্থামবারু সম্বন্ধ জিক্ষাসাবাদ করছে।

পাগनिनी मिट थिएक हिलांत्र शांत्रहे त्राव राज ।

হেদোর গারে ক্টপাথের ধারেই সে বসে থাকে। কখনো বা ভিক্ষে করে। কিন্ত 'একটি পরসা দে বাবা'র চাইতে 'ওরে, শুন বাবু কোথার বলতে পারিস কথাটাই বলে বেলী। ক্রমে তার দেহ থেকে লাবণ্য ঝরে গিরে পথেরই মতন সে মলিন হ'বে উঠতে লাগল। বর ছিঁতে গেলে ছ্-এক দিনের মধ্যে দেখতুম কোথা থেকে নতুন একথানা কোরা ধৃতি কিংবা শাড়ী সে জোগাড় করেছে। কোথার থেত জানি না, মধ্যে মধ্যে তেলে-ভালা খেতে দেখতুম—সে সমরে হেদোর ধারের মুধরোচক তেলেভালা অনেকেরই নরক্যাত্রার পথ স্থগম করেছিল।

কথনো ফুটপাথের ধারে, কথনো বাগানের মধ্যে, বৃষ্টি-বাদলের সময় কাছাকাছি কোনো গাড়ী-বারান্দার তলায়—এইভাবে তার জীবন অগ্রসর হ'তে লাগল।

আমরাও বড় হ'তে লাগলুম—লুকিয়ে-চুরিয়ে সিগারেটে একটাআখটা টান মারার বয়সে পৌছে গেলুম। কিন্তু পাগলিনীর সেই এক
ভাব—শীতাতপবর্থণ মাধায় নিয়ে সে পথচারীদের জিজ্ঞাসা ক'রে চলেছে
ভামবাব্ ঠিকানা, কোন রান্তা দিয়ে গেলে তার বাড়ীতে পৌছতে
পারা যাবে।

ক্রমে—পথচারী বা পাড়ার হাই ছেলেদের সেই একঘেরে আনোদে অরুচি ধরে গেল, তাই তারা তাকে ত্যক্ত করা ছেড়ে দিলে। পথে যারা নিত্য যাওয়া-আসা করে তাদেরও কৌতৃহল মিটে গিরেছে। সবাই নিজের মনের মতন তার একটা ইতিহাস তৈরী ক'রে নিয়েছে, সকলেই তাকে মেনে নিয়েছে। ভামবাব্-পাগলীর মধ্যে ন্তনন্দ্ব আর কিছুই নেই—তার সম্বন্ধে জগৎ ক্রমেই নিরপেক্ষ হ'রে উঠতে লাগল। এর মধ্যে যদি কোন কৌতৃহলী পথিক তার কথার জ্বাব দিত তো পাগলী তার সঙ্গে ইনিয়ে-বিনিয়ে ভামবাব্ সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতে থাক্ত। অঞ্চল্ল আর তার চোথে দেখিনি তবে কর্পে তথনো অঞ্চলমাট ছিল!

দিন বেতে লাগল, আমরা লাবেক হ'রে উঠতে লাগলুম। খদেশীর পৃত ম্পূর্ণে 'বিড়ি' দ্রব্যটি জাতে উঠে গেল এবং আধুনিক বুগের থকরের মতন সকলেই সেই দেশজাত শিল্পটির প্রতি মনোবোগী হ'রে উঠতে লাগল। লুকিয়ে ঝোপঝাড়ের পালে কসে বিড়ি ফোলবার জন্ত প্রার রোজই বিশ্বেল আমরা হেলোর বেতুম,—পাগ্লিনীর লে রূপ আর নেই, বা দেখে একদিন চম্কে উঠেছিলুম। সে ছিল বাকে বলে বেশ পুলকারা। ক্রমে তার অব্দের মেল ও পেলীগুলো গুকিয়ে গিয়ে চাম্ডারুলে পড়তে লাগল, ফুল্মর চোথ ছটো নিম্প্রভ হ'য়ে বেল। চুলগুলো কিছু উঠে গিয়ে ও জট পড়ে বিশ্বি হ'য়ে গিয়েছিল, কিছু একদিন দেখলুম কে তার মাথা কামিয়ে দিয়েছে। ছু-পাশ থেকে গাল-ছটো রুলে চিবুক ছেড়ে নেমে পড়ল—হঠাৎ কোনো অজানা লোকের সামনে পড়লে লে ব্যক্তি ঠিক্রে পালিয়ে বেত।

পাগলিনী এখন আর পথের লোককে শ্রামবাব্র ঠিকানা জিল্ঞাসা করে না। যে কোনো অবেশ পুরুষ, তা সে ছেলেই হোক কি বুড়োই হোক— আলিদনে উন্ততা হ'রে তার দিকে ধাওয়া করে। বেচারী পথচারী ধোপদোন্ত জামা-কাপড় প'রে চলেছে আনমনে, হঠাৎ সমূধে আলিদনোন্ততা সেই তাড়কা রাক্ষসীকে দেখে প্রথমে কিংকর্তব্যবিমৃচ্তা, মৃহুর্ত্ত পরেই প্রাণভরে সেই পলায়ন দৃশ্ত, পথিক-মাত্রেই উপভোগ করত।

কিছু দিন আমোদ উপভোগ ক'রে লোকে এলে গেল। এ ব্যাপারটাও তাদের সরে গেল, আর কিছু মলা পায় না ভারা। কিছু পাগলিনীর তাতে জ্রক্ষেণ নেই, সে সমানে একে-ওকে ধরে বেড়াতে লাগল —কীড, গ্রীষ্, বর্বা, বসজে কোনো বিকার নেই, সেই এক ভাব।

ভারপর আমাকেও একদিন পথ ভেকে নিল যাত্রার তপজ্ঞার। সাভ বংসর ধরে মাভৃভ্যির রাজপথে খুরে-খুরে কভ ঘটনাই দেখলুম, কভ কাহিনীই শুনলুম। কভ পাগলের পালে শুরে-বলে রাজ্ঞার রাভ কাটিরে পথের সঙ্গে পরিচর ঘনিঠ হ'রে উঠল, আ্বার ভেমনি অক্সাৎ পথের সঙ্গে বন্ধুস্ব ছুটে গোল—আ্বার ঘরের ছেলে কিরে এলুম ঘরে।

কলকাতার ক্ষিরে আত্মন্থ হ'য়ে দেখতে পেলুম এখানেও পরিবর্তনের বড় ছুটেছে হ-হ ক'রে। পরিবর্ত্তন ঘটছে তার সামাজিকভার, ভার আন্যান্মিকতার, পরিবর্ত্তন ঘটছে তার মিত্রতার তার ব্যক্তচার। অব্দের পরিবর্ত্তন তার এমন ঘটেছে বে চম্বে উঠতে হয়। কড থোলার বাড়ী হরেছে বাগানবাড়ী, কড বন্ধিতে বলেছে বাজার, কড বাজার হয়েছে ওজাড়, কড এঁকো-পালাড় হয়েছে ওলজার। এরই মধ্যে, একনিন দেখসুম, এই তরকসমূল পরিবর্ত্তন-পারাবারের মধ্যে পাগন্দিনী ঠিক হেলোর ধারে বলে আছে, লাভ বছর আগে বেমনটি তাকে বলে থাকতে দেখেছিলুম।

পাগলিনীর চেহারার মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছে। সেদিন ভাকে বে রকম দেখে সিয়েছিলুম ভার চেয়ে অনেক রুল হ'মে পড়েছে কিছ রুল হ'লেও লেদিনকার সেই বীভংনভার ছাপ ভার চেহারার আর নেই। কয়েক দিন বাদেই ব্রতে পারলুম, ভার সেই ভামবার্-শীকার করার ভারটাও একেবারে কেটে সিয়েছে। কথাবার্তা একেবারেই বলে না বললেই হয়, কেউ পায়ে পড়ে কথা বলতে গেলে চুপ ক'য়ে থাকে, নয় ভ বিশ্রি গালাপাল দেয়। য়াতা দিয়ে হাজার লোক চলেছে, সেদিকে ভার দৃক্পাভও নেই, হঠাৎ মুখ ভূলে বায় দিকে চোখ পড়ল ভার দিকে হাভ বাড়িয়ে বলে—একটা পয়সা দাও না।

সকলকে সমান ভাবে সংঘাধনও করে না, কাক্লকে ছুমি, কাক্লকে বা তুই। শহরওত্ব লোকের টনক নড়ে গেল—হেলোর ধারের স্থামবাবু-পাগলী আর স্থামবাবুর খোঁজ করে না।

'মারও কয়েকটা বছর কেটে গেল। একদিন, ডখন আখিন মাল, ছুর্গাপুজা হ'বে গিরেছে, সামনেই কালীপুজা। সজো খেকে দটা ছ-ডিন মুক্লখারে বৃষ্টির সলে ঠাঙা হাওয়ার বড় উঠে আখিনের বৃক্তে অবাশের আমেজ লাগিয়ে দিলে—বৃষ্টি খেমে যাওয়ার সলে-সলে যাওয়ার ডেজ বেন কেছে গেল।

त्रांकि अक्टो व्यव्य निरम्ह । निःभय बनहीन १४ व्यक्त कम-

কাদা বাঁচিরে বাড়ী ফিরছিলুম—দেখলুম, হেলোর সামনের ফুটপাথে পাগলিনী বসে আছে। আঁচলের থানিকটা ফুটপাথের ওপরে পাড়া, ভার ওপরে চাট্ট মৃড়ি। আমাকে দেখেই বললে—একটি পরসা দে নারে!

আশ্চর্ব ! তার কণ্ঠন্বর তেমনিই রয়েছে—সেই অঞ্চ-সঞ্চল তীক্ষ অথচ করুণ কণ্ঠন্বর ।

একটা পয়সা বের ক'রে তার কাছে বেতেই সে হাত তুলে পয়সাটা নিয়ে আবার খেতে আরম্ভ করলে। তাকে দেখতে-দেখতে কি জানি আমার কেমন একটা কৌত্হল হোলো, আমি তাকে একটা প্রশ্ন ক'রে কেলনুম।

বিশ বছর ধরে দেখলেও তার সব্দে মুখোমুখি কখনো কথা বলিনি। প্রশ্ন করনুম—হাা রে, তোর ভামবাবু এখন কোখায় থাকে ?

পাগলী একবার আমার মৃথের দিকে চাইলে, ভার পরে ভার অর্জাবৃত্ত বুকের আবরণ সরিয়ে বুকের মাঝখানটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

একেবারে চমকে উঠলুম! তবে! তবে কি এত দিন ধরে তাকে বা দেখে এলুম তা কি তার আগল রূপ নম্ন! এই দীর্ঘ দিন ধরে তার সহছে আমার মনের মধ্যে কত ভাঙা-গড়া চলেছে সে কি সব বুধাই গিয়েছে! হোতেও পারে। বিচিত্র নয় বে, পাগলিনীর স্থামবার্—রাম্সাম্বত্র স্থাম নয়। তার স্থাম অন্তরে থেকেও সর্বত্র ছড়িয়ে আছে—তারই আহ্বানে সে কৃল ছেড়ে অকুলে ভেসেছে। একে-তাকে জিল্লাসা করেছে, কোথায় গেলে পাব তাকে? বার-তার কথায় ছুটেছে দিখিদিকে—কোনো বাধা মানেনি, সাংঘাতিক বাধা পেয়েছে অলে, রক্তাক্ত দেহ বিছিয়ে দিয়েছে পথের ওপর—বে পথে একদিন স্থামের পদপাত হবেই। নয় ত বা পথের এক পাশে বসে কাতর কঠে কেনছে—কোথায় গেলে স্থামের দেখা পাব।

ভার পরে একদিন ভাম এলে ভাকে দেখা দিলেন স্থন্মর বেশ্যে,
পথচারীর রূপ ধরে। ভাম এলেন কথনো যুবক, কথনো কিশোর,
কথনো বা বালকের রূপ ধরে। পাগলিনা আহলাদে আটখানা—
ছুটেছে আলিজন করতে কিছ ভাম তবু ধরা দের না। বিগতবৌবনা
লোলচর্মা কুৎসিভা পাগলিনী শবরীর মত প্রতীক্লায় ছিল, এমন সময়
ভাম সাড়া দিলেন অস্তরে—চাপল্য ভার তক্ত হয়ে গেল। বাইরের
লগৎ রইল পড়ে বাইরে, ভার প্রেমালাপ চলতে লাগল ভামের
সংলে অস্তরে।

किहूरे विष्ठिय नत्र !

মাতাল

মাতালের ঠিক সংজ্ঞা এখনও নির্ণীত হয়নি। বে মছপান করে তাকেই কি মাতাল বলা চলে? তা বোধ হয় নয়, কারণ 'মাতাল' শব্দটি অপরাধাত্মক তো বটেই এবং প্রয়োগও হ'রে থাকে প্রায়় আক্রমণ হিসাবেই। বেদ থেকে আরম্ভ ক'রে আজকের নাটক-নভেলে পর্বাস্ভ মাতালের কেলেয়ারী পড়ে, নিজের বা জানাশোনা কোনো মছপায়ী প্র্রাচার্য্যদের ইতিবৃত্ত ভনে এবং নিজে দেখে বিচার ক'রে লোকে মছপায়ীকে 'মাতাল' বলে গালাগালি দিয়ে থাকে।

অথচ এই মদ অনেকেই খায়। দেশ-বিদেশে ঘুরে নানা শ্রেণীর লোকের সংস্পর্নে বাঁদের আসতে হয়েছে সারা জীবন ধরে, তাঁরাই জানেন বে পরিচিতদের মধ্যে শতকরা অস্ততঃ পঁচিশ জন লোক মদ্যণান করে থাকে। বাঁরা মন্থপান করেন না তাঁদের মধ্যে শতকরা একটা মোটা অংশ মন্থপান করেন না—থেতে খারাপ লাগে, বাড়ীর ভয়, স্ত্রীর ভয় ইত্যাদি নানা ভয়ে—মদের প্রতি ভয় বা ঘুণাবশতঃ নয়।

'মাতাল অসহনীয়'—এই বাক্যের মধ্যে কিছু সভ্য আছে নিশ্চর কিছ কথাটা সম্পূর্ণ সভ্য নয়। সহনীয় মাতালও আছে। সংখ্যায় কম হ'লেও এমন লোকও দেখতে পাওয়া বায় যে মছপান করলেও অভন্ত নয় এবং মন্ত অবস্থাতেও যে ভন্ততা-চ্যুত হয় না। এ কথা ভূললে চলবে না যে, ভধু মন্ত-পানের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই 'ভালো'র সংখ্যা আরই হ'য়ে থাকে।

'অধিকারী ভেদ' বাকাটি বে নিশ্চিত সত্য তা আমরা জীবনের নানা কেত্রেই দেখতে পাই। বারা মন্ত্রপানের অধিকার নিয়েই সংসারে আসে ভাদের ছাড়া মন্তপানের অধিকার আর কাকর নেই। কিছ মুক্তিল এই, কে যে সভিচ্বারের অধিকারী আগে থেকে তা জানবার উপায় নেই। সকলেই নিজেকে 'অধিকারী' মনে ক'রে শুরু ক'রে দেয় এবং অনধিকারিছ প্রমাণ হওয়া সন্থেও ছাড়তে পারে না, ভাইতেই মন্তপায়ীর এত তুর্ণাম। যে যুক্তিতে বাক্কা মাজকেই দেবতা করা হয়েছে, সেই যুক্তি অনুসারেই মন্তপায়ীকে 'মাতাল' বলা ছয়েছে। ছেলেবেলায় অনেক মাড়ালই চোখে পড়েছে, তারই কয়েকটা নমুনা এখানে দিছিছ।

বাল্যকালে, বাল্য ও কৈশোরের সদ্ধিকণে, 'মাতাল' দেখনার আগেই ভাগ্যগুণে এক মন্তপায়ীর সংস্পর্শে এসেছিলুম। যার কথা বলছি, তাঁর সদে আমার বয়সের তফাৎ ছিল প্রায় পয়ষ্টি বৎসরের। কিছু বয়সের এই বিপুল ব্যবধান সত্ত্বে আমাদের মধ্যে যে বন্ধুছ হরেছিল তার প্রধান কারণ ছিল ভন্তলোকের অপার উদার্ব্য। আমি, আমার ছোট ভাই ও তিনি—এই তিন জনে মিলে আমরা এমন আভ্যা ক্ষমিয়েছিলুম যে লোকের চোখে তা বিসদৃশ ঠেক্ত। এ কথা একদিন শুনে তিনি হেসেবলেছিলেন—ওরা নিক্ষেরা বুড়ো হয়েছে কি না তাই স্বাইকে বুড়ো দেখে। ওদের কথা কানে ভূলো না ব্রাদার।

তাঁর অন্তরটি ছিল কাব্যময়। কাছে গিয়ে বসলেই, ত্-চারটে এ-কথা-সে-কথার পর প্রায়ই কাব্যের কথা পাড়তেন—অবিক্তি ইংরিজী কাব্য। কাব্যের অলম্বার নয়, কাব্যের ভাবরূপের কথা। বয়সের হিসাবে আমাদের বৃদ্ধি একমাত্র 'লেখাপড়া' ছাড়া আর প্রায় সব বিষয়েই একটু 'ইয়ে' থাকলেও কাব্যসাগরে ভূব মারবার মতন দম তথনো তৈরি হয়নি। কিছু কাব্যের অতি ক্ষম ও জটিল ভাব-স্থাকে যে অভূড় শক্তিপ্রভাবে তিনি আমাদের অভ্নততে পৌছে দিতেন তা শরণ ক'রে আজও বিশ্বিত হই। বালক-মনের হ্রখ-ত্রংখের সঙ্গে এমন সহমন্মিতা তাঁর ছিল যা ক্যাতিং মেলে।

এই ভন্তবাক মন্তপান করতেন । এমনিতেই তাঁর বভাবটি ছিল মিটি, কিছ ববন মন্তপান করতেন তথন তাঁর কথাবার্তা, ব্যবহার মধুরতর হ'রে উঠত। সন্ত্যে হওয়ার সন্তে-সন্তেই আমাদের 'লেখা-পড়া' নাটকের অভিনয় ক্ষর্ক হোতো আর এই সন্ত্যে-বেলাটাই ছিল তাঁর মৌতাতের সময়। শনি, রবিবার ও অন্ত ছুটির সময় বাড়ীর অপোচরে ফুক্লাক্ পালিয়ে মাঝে-মাঝে আমরা ত্-ভাই তাঁর আসরে গিয়ে হাজির হতুম। এই দিনগুলির কথা শতি-সাগরের তলায় মহাম্ল্য রত্নের মতন থিতিয়ে পড়ে থাকলেও তাদের উজ্জ্ব্য ও মাধুর্য আমার সারা-জীবনকে ব্যেশে রয়েছে।

প্রধানতঃ এই কারণেই, হয়ত এর সলে পূর্বজন্মের কিছু সংস্থার থাকলেও থাকতে পারে—মন্থপায়ীর প্রতি একটা কৌতৃহল ছিল ছেলেবেলায়। বয়সের সলে চোখ-কান খুলতে লাগল আর মন্তপায়ীর বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপ প্রকট হোতে লাগল চোখের ওপর।

সে যুগে অর্থাৎ আমাদের ছেলেবেলার কলকাতার রান্তার বেকলে প্রারই মাতাল দেখতে পাওরা বেত। তথনকার দিনের তুলনার এখন মাতালের সংখ্যা অসম্ভব রক্ষের বেড়ে গেলেও পথে-ঘাটে মাতালের কেলেরারী আর দেখতেই পাওয়া বার না, বলা চলে। তার একটা প্রধান কারণ এই বে, ডেকো-হেঁকো মাতালের চাইতে চোরা-মাতালের সংখ্যা বেড়েছে বেলী।

আমাদের পাড়ার ছিল হারাণের দোকান। তার বাড়ী ছিল আহিরীটোলা অঞ্চলে, আর দোকান ছিল এদিকে। আমাদের আন হওরা এন্তক হারাণকে সেই দোকানে দেখেছি। হারাণ ঘুড়ি তৈরী করত। তার মতন ভাল ঘুড়ি তৈরি করতে কলকাতার আর কেউ পারত না কলকাতা মানে, এখানকার মধ্য ও উত্তর-কলকাতা। বালীগঞ্চ বা ভবানী-পুরকে কলকাতার মধ্যে ধরা হোতো না। ভবানীপুরের বাসিন্দারা এদিকে আসতে হোলে বলতেন, কলকাভার বালিছ। বৃড়ি ছাড়া হারাণ লখা ভারের পেছনে কাঠের গোল চাক্তি লাগানো 'ফাইল'ও ভৈরী করত। সকাল সাভটা-আটটা থেকে বেলা বারোটা, আবার ওদিকে বেলা ছটো-ভিনটে থেকে রাত্রি দশটা অবধি, ভার দোকানে গেলেই দেখতে পাওয়া বেত সে কিছু-না-কিছু করছেই—সে ছিল একলা অর্থাৎ কাজের, জন্তু অন্ত কোনো লোক সে রাখত না।

হারাণ ছিল একেবারে আর্টিস্টা। বড় বড় মোটা বাঁশ এনে পিশীলিকার মতন অধ্যবসায়ে সেই বাঁশ চিরে-চিরে ছোট-ছোট কাঁটিক'রে, সেগুলোকে চেঁচে-ছুলে ঘূড়ির কাঁপ তৈরী করত। ছুটির দিন পাড়ার ছেলেরা ঝাঁক বেঁধে হারাণের সামনে গোল হ'রে বলে তার কাল্প দেখত।

পৃঞ্চাশের ওপর ব্য়েস হ'লেও বুড়ো লোককে সে একেবারেই কাছে ঘেঁবতে দিত না। পাড়া-বেপাড়া যত ছেলের সঙ্গে ছিল তার ভাব। আর তারাই ছিল তার বন্ধু।

ছেলেদের কারুর আসল নাম ধরে সে ভাকত না! প্রত্যেকেরই একটা ক'রে সে নাম দিয়েছিল আর সেই নামেই তাকে ভাকত। নামকরণ করার মধ্যেও বিশেষত্ব ছিল—প্রত্যেকের নামই ছিল কোন আনাজের বা সজীর, বেমন—আলু, পটল, ঝিঙে, করলা ইত্যাদি। মানবকের আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে শাক-শজীর আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্র আবিহার করবার প্রতিভা ছিল তার আশ্রুয় রকমের।

একবার পাড়ায় একজনেরা এল। তাদের বাড়ীর একটি ছেলে
ম্যালেরিরায় ভূগে-ভূগে খ্বই কাহিল হ'য়ে গিয়েছিল। ছেলেটির সক্ষে
ভূ-দিনেই আমাদের খ্ব ভাব জমে গেল। নতুন বন্ধটিরও ছিল খুড়ি
ওড়াবার সধ। একদিন বিকেলে ভাকে নিয়ে হারাণের দোকানে
গিয়েছি মুড়ি কিনতে—ছেলেটির গায়ে ছিল সবুজ জমির ওপর লঘালিছি

শালা ভোরাকাটা শার্ট। হারাণ তথন ঘাড় নীচু ক'রে ঘুড়ির কাঁপ চাঁচছিল। আমার সাড়া পেরে মৃথ তুলে চেয়েই বললে—হাঁ। ভাই রাঙা-আলু, এই চিচিক্তে কোখা থেকে জোগাড় করলে ভাই?

বলা বাছল্য, হারাণ আমাকে রাঙা-আলু বলে ডাকত। আমাদের
সেই নতুন বন্ধুর নাম ছিল মনোমোহন, ডাক নাম মোনা। জমিদারের
একমাত্র ছেলে, বাড়ীতে ও দেশে দোর্দ্ধণ্ড প্রভাপ তার। শিশু
অবস্থা থেকে আজে, হন্ধুর, বাবুশোনাই তার অভ্যেস। নেহাৎ
ম্যালেরিয়ার ঠেলায় কলকাভায় চলে এসেছে—ভাকে কি না চিচিলে!
মনোমোহন ভো রেগে একেবারে টং হ'য়ে গেল। সেও ঘুড়ি কিনতে
এসেছিল কিন্ধ ঘুড়ি না কিনেই চলে এল। আমাকে বললে—ঐ
ছোটলোকটার সলে এত ভাব কেন রে ভোর? তোকে রাঙাআলু বলে আর তুই কিছু বলতে পারিস নে?

সপ্তাহখানেক বেতে না বেতে চিচিকের সক্ষে হারাণের এমন ভাব জমে গেল বে তার বাড়ীর লোকেরা পর্যন্ত বলতে লাগল—দিন রাত্রি একটা বুড়োর সঙ্গে তোর এত কথা কিসের রে ?

হারাণের হাল-চালই ছিল এক রকমের। চমৎকার রং-বেরংয়ের
যুড়ি সে তৈরি করত কিন্তু আমাদের মনের মতন রং বেছে মুড়ি
কেনবার উপায় ছিল না। প্রতিদিন তার দোকানের দরজায় একখানা
দ্বেট ঝুলত আর তাতে লেখা থাকত—আজ এক-ঘরলা, আজ সতরঞ্জি,
আজ পদীওয়ালা ইত্যাদি। এক দিনে নানা রংয়ের ছুড়ি বিক্রি না
করার পক্ষে তার মুক্তি ছিল এই যে, রং-বেরংয়ের ঘুড়ি উড়লে
আকাশ মানায় না। আমাদের মুক্তি ছিল ঠিক তার উন্টো, কিছু
আমাদের কোন কথাই সে মানত না। সে বল্ত—তবে অন্ত আয়পা
থেকে কিনে আনো—আজ শেলেটে যখন লেখা হ'য়ে গেছে এক-ঘরলা
তথন অন্ত ঘুড়ি জার এখানে বিক্রি হবে না।

আমরা বলতুম—ও:, একেবারে হাইকোর্টের বিচার !

হারাণ হেনে-হেনে বলভ—আমার বিচার হাইকোর্টের বিচারের বাড়া! বুঝলে ভাই রাঙা-আলু, হাইকোর্টের রার আপীলে টলে বেডে পারে কিছ হারাণের বিচার কোনো আপীলেই টলে না।

এমনি অমুত ছিল তার হাল-চাল।

একদিন বিকেলে হারাণের দোকানে ঘুড়ি কিন্তে গিরে দেখি,
পাড়ার ছর-সাতটি ঘুড়ি-উড়িয়ে ছেলে হারাণের সামনে উরু হয়ে
বলে রয়েছে। বিমর্ব তালের মুখ—সামনে আসনপিঁড়ি হ'য়ে গালে
হাত দিয়ে মাটির দিকে চেয়ে বলে আছে হারাণ। সেই পরিস্থিতির
গাভীর্য রক্ষা ক'বে ইশারাতে এক জনকে জিজ্ঞাসা করলুয়—ব্যাপার কি ?

वसू काता कथा ना वरन इंगात्रार्छ हात्रागरक स्मिथिस मिरन।

কিছুই হদিশ না পেয়ে হারাণকে বলল্ম—একথানা দেড়তে খুড়ি দাও তো ?

হারাণ এতকণ মুখ নীচু ক'রেই ছিল। আমার আওরাজ পেরে মুখ ভূলে অতি কাতরভাবে বলল—আজকে আর ঘুড়ি বিক্রি হবে না ভাই রাঙা-আলু।

ভার মুখের চেহারা দেখে ও কথা ওনে মনে হোলো, বাড়ীতে কেউ মারা-টারা পেছে।

সহামুত্তির স্থরে জিজাসা করলুন—কি হয়েছে হারাণ ?

হারাণ অভাবতই বক্-বক্ করতে ভালবাসত। ছ-হাতের সবল ভার মুখও সমানে চলতে থাক্ত। এক-এক দিন ঘুড়ি কিনতে গিয়ে ভার বক্বকানি জনতে-জনতে এত দেরী হ'য়ে যেত বে পালিয়ে আসতে হোভো। অনেককণ বাক্-সংষম ক'রে এবার ভার ধৈর্বচুাভি হোলো। হারাণ জল করলে—আরে ভাই রাঙা-আনু, কি বলব! আরু ক'দিন থেকে ওপরের ক্ষের, একটা শান্ত চক্-চক্ ক'রে নড়ছে। কাল রাত থেকে বিভটা লেগে গেছে সেই দাঁভটার পেছনে, দাঁভটাকে ওথান থেকে সে ভাড়াবেই ভাড়াবে—থেতে, শুতে, কাজ করতে কিছুতেই ছতি পাছিছ না। বিভটাতে বেশ ক'রে মনের লাগাম চড়িয়ে টেনে নিয়ে এসে কাজ করতে শুরু করি আর সেই স্থযোগে বিভটা আবার দাঁতের পেছনে লেগে যায়। আরে ভাই, কাজ করব হাতে, মন থাকবে হাতথরা, ভবেই ভো হাতের কাজ হবে! ভা সেই মনই বিদি হাত থেকে ছুটে গিয়ে জিভের সঙ্গে যোগ দেয় ভো হাতের কাজ কি ক'রে হয়!

কান্ধ করতে না পারার এমন কিন্টারগাটেনীয় ব্যাখ্যা ওনে হাসি পেলেও চেপে যেতে হোলো। বলসুম—ও দাঁডটা ভূলিয়ে ফেল।

হারাণ একটু বক্ত-হেনে বল্লে—রাঙা-আলু ভাই, তুমি কি আমায় ছেলেমান্থব পেয়েছ? এই ঝিঙে-ভাইও বলছিল দাঁতটা তুলে ফেলতে। কিছু আমি ঠিক করেছি, তুর্মু এটা নয়, বিজ্ঞা-পাটি দাঁতই তুলে ফেল্ব।

হারাণ ছিল ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। হঠাৎ তার ঐ সর্বনাশা স্পৃহা দেখে আঘরা ভড়কেই গেলুম। ঝিঙে জিজাসা করলে—কেন ? সব গুলো তুলবে কিসের জন্ম ?

হারাণ বললে—বিডে-ভাই, ও শক্রুর শেষ রাখতে নেই। একটা দাঁতে যদি এক হপ্তার কাজ বন্ধ করে, তা হলে বিদ্রেশটাতে ক'হপ্তা হয় বল দিকিন? এত দিন যদি কাজ না করতে পারি তা হ'লে আমার বন্ধণা ভোগ ও কতির কথা হেড়েই দাও, কত লোকের কত রক্ষের অন্থবিধা হবে বল দিকিন? কাজ কি ভাই অভ হালামার! শাল্পে বলেছে, শক্রুর শেষ রাখতে নেই, বাসু।

এই রকম সব পাকা-পোক্ত হিসাব ও যুক্তির বাঁধনে হারাণ রাজ্যের ছেলের মন বেঁধেছিল। কিছুল্ল চুপচাপ কাটবার পর একজন বললে—আমাদের হারাণের বুদ্ধি আছে, বে বাই বলুক।

কথাটা জনে হারাণ বেশ খুলী হ'বে বললে—ঢ' ্যাড়ন্ ভাই, ভোমাদের এই খুড়িওরালা হারাণ অনেক হারাণবাবুর চেয়ে বৃদ্ধি ধরে বেশী। বিদি বল, তবে তুমি এ কাজ করছ কেন, হাইকোর্টের জজ হ'লেই ভো পারতে। তার উত্তরে আমি বলব, বৃদ্ধি কম থাকার দর্শন বে হাইকোর্টের জজ হতে পারিনি তা নয়—এ কাজ করাছে আমার নেয়ং।

এই বলে হারাণ একটা দীর্ঘনিঃশাস ছাড়লে।

তাকের ওপরে তাড়া করা ঘুড়ি রয়েছে দেখে বলনুম—ঐ তো অত ঘুড়ি রয়েছে, দাও না।

হারাণ বললে— তা কি হয়! আজ আর ঘুড়ি বিক্রি হবে না ভাই, লব বাড়ী যাও।

বিকেল বেলাটা হোলো মাটি। ঘুড়ির বদলে—হারাণ কাল দাঁড ভোলাবে সেই সংবাদটি সংগ্রহ ক'রে সেদিন যে-যার বাড়ী ফেরা গেল।

পরের দিন বিকেলে হারাণের দোকানে গিয়ে দেখলুম বেশ নিবিষ্ট চিত্তে সে কাজ করছে। একখানা খুড়ি কিনে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম —কি হারাণ, দাঁত তুলিয়েছ না কি ?

হারাণ বললে—দেখ ভাই রাঙা-আলু, কাল সারা-রাত্রি ঘুম্ইনি, খালি ভেবেছি। ভেবে দেখলুম যে, দাঁতের ওপরে খুবই অবিচার করা হচ্ছে। আছো, দাঁতের ব্যথা না হ'রে যদি পায়ে যন্ত্রণা হোভে। ভা হোলে পা-টা কেটে ভো আর ফেলে দিতে পারতুম না। আরে, নড়া-দাঁতের ধর্মাই হলো কটকট-খনখন করা। মন যদি ওদিকে বায় ভো মনের দোব—মনের দোবে দাঁতকে কেন সাজা দেবে।। ঠিক বলছি কি না, বল তুমি ?

টিক বলছ, বলে ভখনকার মতন পালিয়ে বাঁচলুম।

ভধনকার দিনে বৌবালার থেকে আরম্ভ ক'রে সেই গ্রে স্থাটি অবধি বড়-রাতার ওপরেই অনেকগুলো মদের দোকান ছিল। পথচারীরা এক পোয়। রাতা দ্র থেকেই নাকে কাপড় দিড় আর দোকানের কাছাকাছি এসে দিড কান চাপা। দোকানের ভেডরে সেই সকাল থেকে রাত সাড়ে নটা অবধি অসংখ্য মাতাল ভারত্বরে গান, তর্ক, ট্যাচামেচি, ঝগড়া করতে থাক্ত। সরকারী ছকুমে এই সব দোকান এখন বড়-রাতার ধারে সক্ষ-সক্ষ গলির মধ্যে উঠে গেছে। এতে ভিন পক্ষই হয়েছে প্র্নী। বড়-রাতা থেকে একটা বীভৎস দৃশ্র সরে গেছে। মাতালেরাও বেঁচেছে—চুক্তে কেকতে চেনা-লোকের চোখে পড়া, রাতার বেরিয়ে ছ্-কদম বেডেনা যেতেই পুলিশ কনস্টেবল, যারা মালদার মাতাল শীকার করবার জন্ত্রই ওৎ পেতে বসে থাকত, তাদের ধর্মরে পড়া ইত্যাদি হাজার হালামা থেকে রক্ষা পেরেছে। দোকানদারেরাও খুশী, কারণ তাদের থকের বড়েছে।

আগেই বলেছি, সেকালে প্রায় সব সময়েই রাস্তার ভব্রপোক, ছোটলোক সব শ্রেণীরই মাতাল দেখতে পাওরা বেত। 'স্থরাপানে লাম্য ভাব প্রবল হয়' কথাটা খুবই সভিয়। কারণ সম্প্রদারগত প্রভেদ থাকলেও ব্যবহারগত প্রভেদ তাদের মধ্যে বিশেব দেখতে পাওরা বেত না। কেউ নাচছে, কেউ গাইছে, কেউ বা কাল্লনিক শক্রের উদ্দেশে হাত-পা ছুঁড়ছে, আধ-আধ ভাবার এড়িরে গালাগালি দিছে। হয়ত তুই প্রাণের বন্ধু একসলে বসে মন্ত্রপান ক'রে ফিরছে পথে কি তর্ক হ'তে হ'তে লেগে গেল তুম্ল কাও—বাড়াবাড়ি করলে পুলিশে কলের গ্রুঁডো লাগাতে-লাগাতে টেনে নিয়ে বেত থানার। কেউ বা পথের প্রণরেই হাত-পা চিভিরে লম্বা—বসন অসংবৃত, সংজ্ঞা নেই।

সামনে-বাড়ীর লোকেরা বালডি-বালডি ত্বল এনে মাধার চালছে— কেখে-দেখে শিউরে উঠতুম আর ভাবতুম, এখন আত্মবিত্ররণকারী অসংব্য লোকে মূল্য দিয়ে কেনে কেন ?

হারাণ বল্ড—ব্যাটারা বা হলম করতে পারবিনে তা গিলিস্কেন!

এমন বে বুদ্ধিমান, দার্শনিক হারাণচন্দ্র, নেহাৎ বরাতে নেই বলে বে হাইকোর্টের জজ না হ'রে চিঠির ফাইল ও ঘুড়ি ম্যাস্ক্ল্যাকচার ক'রেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে, সেও মছপান করত—ভবে বছরে একবার মাত্র।

একদিন ইস্কুলে যাবার জন্ত পথে বেরিয়েই দেখি, হারাণ তার পাশের পরোটাওয়ালার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চখরে সেই দোকানদারকে গাল পাড়াছে। হারাণের এতদবস্থা আর আগে কর্থনো চোখে পড়েনি। চোখা-চোখা বোলচাল ছাড়লেও ঝগড়া-ফ্যাসাদকে সে অত্যন্ত অপছন্দ করত এবং তা থেকে দুরে থাকবার জন্ত আমাদেরও উপদেশ দিত।

আত্তে-আতে তার কাছে গিরে জিজানা করলুম—কি হয়েছে হারাণ ? 'চোপরাও'—বলে সে এমন টেচিয়ে ধমক ছাড়লে যে দশ হাত দুরে ছটকে গেলুম। বাপ রে! ব্যাপার কি!

ইভিমধ্যে আরও প্রটিকয়েক পাড়ার ছেলে বই বগলে দেখানে এনে জমা হোলো। হারাণ আমাদের উদ্দেশে চীৎকার ক'রে বলতে লাগল—ছেলেমাত্বৰ আছ ছেলেমাত্বৰে মতন থাকবে—ইন্থুলে যাচ্ছ সিদে ইন্থুলে চলে যাও সব।

কথাওলো বলেই হারাণ আবার পরোটাওয়ালাকে গালাগাল দিতে আবস্ত করলে।

भरतांगि खाना हिम्मूचानी ह'रन**७ वाःना छावा दन्य छानहे** ब्रुवरण

পারত ও বলতে পারত। কিছু পাছে সেই ভাল-ভাল অভিধান বহিছুতি বাকাগুলি পরোটাওয়ালার ব্যতে কট হয় সেজজ হারাণ সেগুলিকে হিন্দীতে ভর্জমা ক'রে বলতে লাগল, আর তাই শুনে রাস্তার লোকেরা হো-হো ক'রে হাসতে আরম্ভ ক'রে দিলে। একাধারে নতুন-ধরণের গালাগালি আর সেই অভুত হিন্দী ভাষা শোনবার জক্প ক্রমেই ভাড় বাড়তে লাগল।

একটা জিনিস বরাবর দেখেছি বে বাঙালীর পেটে মদ পড়লেই, প্রায় ক্লেনেই সে ইংরাজী, হিন্দী, উন্ন্, করাসী ভাষায় বুলি কাটতে ও ক্লকরে—ইংরেজ কিংবা করাসী মাতালকে স্পানিশ কিংবা ভূকী ভাষায় কথা বলতে গুনিনি। যা হোক্, হারাণ সেই অভূত হিন্দী ভাষায়—যা একমাত্র হারাণ ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না অথচ সকলেই ব্যুতে পারে—পরোটাওয়ালাকে গালাগালি দিয়ে চলল।

পরোটাওয়ালা লোকটা ছিল আকাট বঙা। আশ-পাশের বড হিন্দুস্থানী দোকানদারদের মুক্করী ও ভরণাস্থল ছিল লে। হারাণের মতন দশটাকে লে খালি হাতেই পাট ক'রে দিতে পারত। কিন্তু দেখলুম ঝে, হারাণের সম্বন্ধে নির্ক্কিকার হ'রে লে নিজের কাজ ক'রে চলেছে।

কৌতৃহল সম্বরণ করা ক্রমেই ছ:সাধ্য হ'রে উঠল। পরোটাওয়ালাকে জিজাসা ক'রে ফেলা গেল—কি হয়েছে, হারাণ ভোমাকে এত গালাগালি দিছে কেন?

পরোটাওয়ালা তার নির্কিকার**দ বন্ধা**র রেখেই ব্ললে—কি **দাবার** হবে! ব্যাটা সরাব টেনেছে।

কথাটা শুনে মনের মধ্যে একটা থাকা লাগল—ফু:খের নয়—চমকের।
মনে হোলো—এঁ্যা, হারাণও লরাব থার ! ইছুলের দেরী হ'রে বাচছে
দেখে অমন মন্ধা ছেড়ে ভাড়াভাড়ি সরে পড়তে হোলো।

ইকুল থেকে ফিরে এলে দেখি, লে এক বিরাট ব্যাপার! পরোটার

লোকানের সামনে খুব ভিড়, তার মধ্যে বই-ছাতে ইছুল-কেরং ছেলেই বেশী। ভিড়ের মধ্যে চুকে দেখি হারাণ ও পরোটাওয়ালা ছ-জনে মুখোমুখি দাঁড়িরে—হারাণের হাতে খুড়ির সক একটা কাঁপ স্থার পরোটাওয়ালার হাতে সক মাখা-বাঁকানো লখা একটা লোহার শিক, বা দিয়ে তাদের সেই বিপুলগর্ভ উন্থনে খোঁচা দেওয়া হ'য়ে থাকে। কিছ পরোটাওয়ালার হাতের অস্ত্র হারাণের হাতের অস্ত্রের চেয়ে ঢের বেশী ভয়াবহ হোলেও হারাণের মুখনিঃস্থত মিনিটে পঞ্চাশটা বোমার আঘাতে সে ব্যক্তি একেবারে কিংকর্ত্ব্যবিমৃত হ'য়ে পড়েছে—একেবারে সম্পোহিত অবস্থা।

রাজ্যের লোক সেই মজা দেখতে দাঁড়িয়ে বেতে লাগল। এক ভব্রলোক হারাণকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে হা ?

হারাণ হ্রার ছেড়ে বললে—কি হয়েছে! কি হয়েছে এই মেড়োকে জিকাসা কর।

পরোটাওয়ালা বলতে লাগল—বাবু, লোকটা সরাব থেয়ে আজ সকাল থেকে আমার লোকানের সামনে এই হালামা লাগিয়েছে। সারাদিন এই ভড়ি, থক্ষের আসতে পারছে না, সকাল থেকে বিক্রি-বাটা আমার বন্ধ হ'লে গেছে।

হারাণ তার হাতের অন্ধ আপ্সাতে-আপ্সাতে বললে—তোর লোকানে কেউ পা দেবে না, শালা চোর!

পরোটাওয়ালা একবার চোখ পাকিয়ে হারাপের দিকে চেয়ে আবার সেই ভক্রলোকের দিকে ফিরে বললে—দেখচেন !

ভদ্রলোকটি উদাসভাবে বললেন —পুলিশে থবর দাও।

সেদিনে এক চোর-ভাকাত ছাড়া পুলিশকে ভর করে না এমন বীর লাখে একটা মিলত কিনা সন্দেহ। পুলিশের নাম হওরা-মাত্র ভিড় পাতলা হ'বে গোল। প্রোটাওরলা। গুটি-গুটি ভার দোকানে উঠে উন্নের সামনে গিরে বসল। হারাণ কিন্তু তথনো গাঁড়িরে—এমন সময় একটি ছেলে চেঁচিয়ে উঠল—এ লাল পাগড়ী—

আর বার কোথা! হারাণ দৌড়ে, গড়িরে, হামাগুড়ি দিতে-দিতে নিজের দোকানে ঢুকে পড়ল।

শোনা গেল, বছর-কয়েক আগে হারাণ একদিন একথানা পরোটা কিনেছিল, তাতে দোকানদার নাকি তরকারী দিয়েছিল কম। সেদিন থেকে হারাণ যতবার মত্তপান করে ততবারই নাকি সেই একদিন কম তরকারী দেওয়ার জন্ত — যে তরকারী পরোটার সঙ্গে শ্রেফ দয়া ক'রে দেওয়া হ'য়ে থাকে—হালামা করে।

বাড়ীতে এসে হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসতে না বসতেই হারাণের ছকার শোনা যেতে লাগল। বাড়ীতে একজন গুরুত্বানীয়া মড়িলা বল্লেন—আজ তোমাদের হারাণ মদ খেয়ে সকাল থেকে রান্ডায় এমন হালামা লাগিরেছে যে কান পাতা যাছে না।

আর একজন বল্লেন—অমন লোকের কাছ থেকে কারুর কোনো জিনিষ কেনা উচিত নয়।

ঘুড়ির মাধ্যমে হারাণের কিছু-কিছু গুণ আমাদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে, হছে বা হবার সন্তাবনা আছে—এই রকম কিছু মন্তব্য আশা করছিলুম সে তরফ থেকে, কিন্তু সে রকম কিছু না হওয়ায় তাড়াতাড়ি থেয়ে আবার ছুটলুম হারাণের থেল্ দেথতে।

গিয়ে দেখি যে, হারাণ আবার আসরে নেমেছে। চারিদিকে আবের চাইতে ভীড় বেশী। অবস্থা তার খুবই খারাপ, পা টলমল করছে, কথাবার্ত্তা যা বলছে তা ভনে মনে হচ্ছে যে কথা বলতে তার কট্ট হচ্ছে! কিছ সে অস্থ্যবিধার জন্ত কথা কিছু কম বল্ছে না।

শোনা গেল, পুলিশের নামে ভর পেয়ে দোকানে ঢুকে সে উপরি-উপরি

করেক পাত্র টেনে এমন তৃ:সাহস সঞ্চয় ক'রে এসেছে বে রণাঙ্গণে ভূপভিত হবার আগে নড়বে বলে মনে হয় না।

হারাণ মদ-দর্পে টলে-টলে পরোটাওয়ালাকে ইংরিকী ও হিন্দীতে
মিলিয়ে উচ্চরবে উপদেশ দিছে, এমন সময় ভীড়ের সামনেই কোণা থেকে
একটা ভাড়াটে গাড়ী এসে দাড়াল। গাড়ীর ভেতর থেকে জন চারেক
ভক্তবেশধারী ব্বক টগ্-টগ্ ক'রে নেমে ভীড় ঠেলে একেবারে হারাণের
সামনে এসে দাড়াল। এক জন জিজ্ঞাসাকরলে—এ কি কেলেজারী হছে ?

হঠাৎ তাদের আবির্ভাবে হারাণ একেবারে হ-য-ব-র-ল। সে কি একটা বললে বটে, কিন্তু তা বুঝতে পারা গেল না।

এক জন ধমকের স্থারে বললে—চল, বাড়ী চল।

এবার হারাণ অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভাবে একবার—যা যা, বলে সে অবস্থার
যতথানি তাড়াতাড়ি সম্ভব দোকানের দিকে দৌড় দিলে। আগন্তকেরা
আর বাক্যব্যয় না ক'রে হারাণকে ধরে একেবারে কোলপাঁজা ক'রে
তুলে ফেল্লে। হারাণ হাত-পা ছুঁড়ে কি সব বলতে লাগল কিন্তু ততক্ষণে
তারা তাকে গাড়ীর মধ্যে পুরে ফেলে গাড়োয়ানকে ইন্দিত করতেই
গাড়ীখানা ছুটে বেরিয়ে গেল।

এক মিনিটের মধেই ভীড় একবারে সাফ্। শুনলুম, ওরা হারাণের ছেলে। মদ খেয়ে বাড়াবাড়ি করলে কি ক'রে যে ওরা টের পার তা কেউ জানে না। প্রতিবারেই হঠাৎ এসে পড়ে আর কথা বলতে না দিয়ে তারা বাপকে ঐ রকম চ্যাংদোলা ক'রে ধরে নিয়ে যার।

পরদিন ইস্কুল থেকে ফেরবার মূথে দেখলুম, হারাণ লন্ধী ছেলের মতন স্বাড় হেঁট ক'রে ফাইল তৈরি করছে।

মণি বাবু

আর একজন অত্ত চরিত্রের মাতাল দেখেছিলুম ছেলেবেলার, তাঁর নাম ছিল মণিবাব্। বিশিষ্ট ভদ্রবরের ছেলে এবং নিজেও তিনি এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ছিলেন। লেখা-পড়া বেশ ভালই জানেন বলে শুনতুম। কোন এক সওলাগরী আপিলে মোটা মাইনের চাকরী করতেন। অতি ভালমাহ্য, এত ভালমাহ্য যে পাড়ার কারুর সঙ্গে কথাটি পর্যন্ত কইতেন না।

মণিবাবু মন্তপান করতেন বটে কিছু মদের আহ্বন্ধিক গণ্ডপোল, চেঁচামেচি বা হালামার ধারে-কাছে ঘেঁষতেন না। তবে নিজে কোন হালামা-ছজ্জং না করলেও গ্রহবৈশুণো তাঁকে নিয়ে পাড়ার হালামার অস্তু ছিল না।

প্রতিদিন সকালবেলা নটার সমর মণিবাবু চোগা-চাপকান, তার ওপরে ধপধণে শাদা পাকানো চাদর গলার জড়িরে আপিসে বেরুতেন। এ নিরমের আর নড়-চড় ছিল না। মণিবাবুকে দেখে পাড়ার চাক্রে বাব্রা সমর ঠিক করতেন। কিন্তু আপিসে বাবার সমর ঠিক থাকলেও আপিস থেকে কেরবার সমর কিছু ঠিক ছিল না তাঁর। প্রতি রাত্রে ন-টা থেকে ত্-টোর মধ্যে তিনি বাড়া ফিরতেন ভাড়াটে গাড়ী চড়ে, জার প্রতি রাত্রেই না হোক, সপ্তাহে অন্ততঃ তিন দিন তাঁর জন্তে রাত তুপুরে লাগুত হালামা।

ষণিবাবু ডেকো-হেঁকো লোক ছিলেন না। মন্ত্রপান করতেন লুক্তির, গোণাগুল্ভি ছ-তিন জন বিশেব বন্ধু ছাড়া আর কারুর সঙ্গে নয় এবং শেব দিন অবধি তাঁর ধারণা ছিল যে, থাদের সঙ্গে তিনি মন্তপান ক'রে থাকেন, তাঁরা ছাড়া আর কেউ জানে না তাঁর মদ থাওয়ার কথা।

মণিবাবু ছিলেন বিপত্নীক। ত্ন-টি নাবালক ছেলে, তারা দাদামশায়ের মোটা বিষয়ের মালিক—মান্ত্য হচ্ছিল কাকা-কাকীমাদের হাতে। সংসারে সম্ভানে তাঁকে কোন ঝঞ্চাটই পোহাতে হোতো না।

আগেই বলেছি, মণিবাবু নিজক্বত হাঙ্গামায় কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন না। আফিসে যেতেন সকাল নটায় আর বাড়ী ফির্নুতেন অনেক রাত্রে ভাড়াটে গাড়ী চেপে।

তথনকার দিনে বড় রান্তাগুলি ছাড়া কলকাতার গলিপথ ন-টা-দশটার মধ্যে একেবারে নিশুতি হ'রে থেত। রাত তুপুরে পাড়ার ছ্যাক্ড়া গাড়ী চুকলে আওরাজের চোটে অর্জেক লোকের ঘুন ভেঙে থেত। সে সময়ে ভাড়াটে গাড়ী তো দূরের কথা, বাড়ীর গাড়ীর চাকাতেও রবার ব্যবহৃত হোতো না। শহরবাসীদের কর্ণবিবর এখানকার মতন আওরাজ-সহ হ'য়ে ওঠেনি, তাই সামান্ত শব্দেই তাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হোতো।

মণিবাব্দের বাড়ীট। ছিল বেশ বড় আর তিনি থাকতেন সেই পেছনকার দিকের একটি বরে। কারণ, লোক-জনের চীৎকার, ছেলে-পিলেদের চাঁা-ভাঁা তিনি সহা করতে পারতেন না, নিরিরিলি থাকতে ভালবাসতেন। তাঁর বরে পৌছতে হ'লে অনেকগুলি সিঁড়ি, দালান ইত্যাদি পার হ'তে হোতো; কিন্তু প্রতি রাত্রেই এমন সন্তর্পণে তিনি এই বন্ধর পদ্বা অতিক্রম করতেন যে একটা ঠোকর থাওয়ারও শব্দ পর্যন্ত হোতোনা।

বা হোক, এবার মণিবাবুর হালামা হুরু হোলো।

মণিবাবু রাত-হপুরে পাড়া জাগিয়ে ছ্যাকড়া গাড়ী চড়ে তো বাড়ী এলেন। পাছে পাড়ার কেউ জানতে পারে বা কারুর চোঝে প'ড়ে বান এই আর্শকার গাড়ীতে বসেই যতথানি সম্ভব চার্মিক চেয়ে অতি সম্ভর্পনে টুপ ক'রে নেমে ভেজান দরজাটি ঠেলে বাড়ীর মধ্যে চুকে পড়লেন। বাড়ীর চাকর বেচারা কালকর্ম সেরে বাবুর অপেক্ষার ভেজান দরজার পাশে বসে সজাগ হ'বে চুলছিল, বাবু বাড়ী চুকতেই সে দরজার খিল লাগিরে দিয়ে সচান হ'বে গুবে পড়ল।

ওদিকে গাড়োয়ান কিছুক্প চুপ ক'রে থেকে ভাড়ার জন্ম টেচামেচি
ক্ষক ক'রে দিলে। আলকের দিনে বাস, রিক্শ, ট্যাক্সি প্রভৃতি নানা
রক্ষ যান-বাহন চালু হওয়ায় ছ্যাকড়া গাড়ীর গাড়োয়ানদের কঠবর
অপেকাকৃত মেলায়েম হ'য়ে পড়েছে। তথনকার কালে তাদের কঠবর
ছিল ভয়াবহ এবং আদালতে না গিয়ে তাদের সঙ্গে বগড়া ক'রে বেতবার
ক্ষতা শহরে ত্-চারজন গোণাগুন্তি লোক ছাড়া আর কাকর
ছিল না।

বা হোক্, গাড়োয়ানের সেই চীৎকারে আলেগাশের বাড়ীর লোক জেগে উঠে রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়াতে লাগল—যাদের সে স্থবোগ নেই তারা বরে বসেই রাগ হজম করতে থাকল।

এদিকে গাড়োয়ানের চীৎকার ধাপে-ধাপে চড়ছে, ওদিকে মণি বাবুর কোন সাড়া নেই। প্রতিবেশীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে জারস্ত করলে – রোজ রোজ তো এ-হালামা আর সহু হয় না হে! সবাই সই ক'রে পুলিশে একথানা দর্যান্ত না পাঠালে এ তো থামবে না।

ওদিকে গাড়োয়ান ততক্ষণে কোচবাক্স থেকে নেমে পড়ে দমাদম শব্দে দরলা ঠেঙাতে ও মরিয়া হ'ষে চাঁচাতে লাগল। পাড়ার কেউ-কেউ আপত্তি করার গাড়োয়ানের সঙ্গে তাদেরও কিছু বচসা হ'য়ে গেল এরি মধ্যে। চাকর বেচারীর ঘুণটি জমতে না জমতে ভেঙে গেল, সে দরক্ষা খুলে বেরিয়ে এল। পাড়ার সবাই বাবুকে না পেয়ে তার ওপরেই তবি স্কৃক ব'রে দিলেন—বা বাবুর কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে এসে গাড়োয়ানকে বিদেশ করে দে।

কিন্তু রাত্রিবেলা চাকরের বাড়ীর মধ্যে ঢোকার উপায় নেই, পথে ছ-ছ-টো দরজা বন্ধ হ'রে গেছে। কি হবে উপায়! শেষকালে ঘণ্টা-ছয়েক গলাবাজীর পর কোনদিন পাড়ার, কোনদিন বা মণিবাবুর বাড়ীর কেউ, কোন দিন বা চাকরেই ভাড়া মিটিয়ে দিত। হিসাব-নিকাশ কি ক'রে হোতো তা জানি না।

পরদিন সকালে ঠিক ন-টার সময় দেখা যেত, মণিবার সেত্রে-গুল্ আপিসে চলেছেন। মুখে সেই নৈর্ব্যক্তিক সলজ্জ হাসি আর অন্তরে নিশ্চিত নিশ্চিস্ততা,—তিনি যে মহাপান করেন তা কেউ জানে না।

মধ্যে-মধ্যে মণিবাবু গাড়ী থেকে নামতেই পারতেন না অর্থাৎ বেছঁ স হ'রে পড়তেন। এই রকম সব সময়ে তিনি বৃদ্ধি ক'রে চেনা গাড়ী ভাড়া করতেন। বাড়ীতে গোঁছে বাবুর অবস্থা দেখে গাড়োয়ানের চক্স্পির! তার চীৎকারে সাভ পাড়া জেগে গেল, কিন্তু মণি বাবু আর ওঠে না। উঠবে কি করে! তিনি তথন বেখানে গোঁচেছেন সেখান থেকে কোন মাতালই সে রাত্রে আর ফিরতে পারে না। গাড়োয়ানের চীৎকারে অন্থির হ'য়ে পাড়ার লোকেরা নেমে এসে ধরাধরি ক'রে তাঁকে গাড়ী থেকে নামাত আর বাড়ীর লোকেরা চাাংদোলা,ক'রে তুলে নিয়ে বেড।

কোন-কোন দিন এই রকম বেছঁস হবার মতন অবস্থা হ'লে মণিবার বৃদ্ধি ক'রে ত্ব-এক জন বদ্ধু নিয়ে আসতেন। যাঁরা তাঁকে বাড়ী অবধি পৌছে দিতে আসতেন, তাঁদের অবস্থা মণিবাবুর চেয়ে কিছু ভাল থাকলেও দেখেছি বে, তাঁদেরও পদহর ইচ্ছাশক্তির শাসনের অতীতে চলে গিরেছে। প্রায়ই মণিবাবুকে ধরাধরি ক'রে নামাতে গিরে নিজেরাই থেতেন আছাড়।

উ:, সে সব দিনের কথা মনে হ'লে আত্মপ্ত হংকম্প উপস্থিত হয়।
গাড়ীখানা তো মনিবাবুদের বাড়ীর সামনে এসে দাড়াল। বন্ধরা
অনেক কসরং পাঁচ ক'রে কোনো রক্ষে তো রাতার নামদেন! ভার

পরে স্থব্ধ হোল! —এই মোণে, ওঠ—ওঠ রে, বাড়ী এসেছে—মোণে, এই —ভাৎ, এই মোণে, ওঠ না ভাই—এই চলল প্রায় আধ বন্টা ধরে!

মোণে ওঠে না, কিন্তু পাড়ার সবাই উঠে পড়ঙ্গ। ওদিকে দেরী হচ্ছে দেখে গাড়োয়ান ওপর থেকে হুরু করঙ্গে—এ বাবু, আর কত দেরী হবে ?

বন্ধুবর লাগালে তারপর গাড়োয়ানের সঙ্গে ঝগড়া—ও:, ব্যাটা একেবারে লাটসাহেব !

গাড়োয়ান বললে—গালাগালি দিও না বাবু, ভাল হবে না।

—কি করবি রে তুই ?

মারামারি লাগে আর কি!

গাড়োয়ানের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বন্ধুদের উৎসাহ গেল দ্বিগুণ বেড়ে। তারা আবার প্রাণপণ কোরে চীৎকার স্থক্ত করলে—নোণে, এই মোণে, ওঠ রে বাড়ী এসে গিয়েছে।

শেষকালে পাড়ার লোকেরা প্রাণের দায়ে নেবে এসে দরজা খুলিকে চ্যাংদোলা করে মণি বাবুকে বাড়ীর মধ্যে নিম্নে যেত।

একদিন, তথন গ্রীমের ছুটি চলেছে, ক'দিন থেকে দারুণ গরৰ পড়েছে, অফিস থেকে থবর এল যে, মণিবাবু সেথানে হঠাং খুব অফুছ হ'য়ে পড়েছেন। মণি বাবু ছিলেন বাড়ীর বড় ছেলে। তাঁর পরের ভাই চাকরী করত কোথার, আর ঘটি ভাই পড়ত কলেজে। এই ঘই ভাই থবর পেরে তখুনি ছুটল দালার অপিদে।

সেদিন সন্ধ্যা-রাতেই বেহ'ন হ'রে মণি বাবু বাড়ী ফিরলেন ভাইরেদের সঙ্গে। সকলে ধরাধরি ক'রে তাঁকে গাড়ী থেকে নামিরে নিয়ে চলল।

তার পর সারা রাত ডাক্তার-বন্থির আনাগোণার পাড়া মুধরিত হ'রে-উঠল কিন্তু কিছু তেই কিছু হোলো না। শেব রাত্রের দৈকে মণিবাবু শেব হরে গেলেন। পাড়ার লোকদের ডাকতে হোলো না, তারা বে যার গামছা কাঁথে নিয়ে বেরিরে পড়ল। প্রভাত হবার আগেই মণি বাব্র শব বের ক'রে নিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

মদ খেয়ে মণিবাবু জীবনে এক দিনও হালামা না করলেও তাঁকে নিরে হালামার অস্ত ছিল না।

পরদিন, শ্মশান থেকে ফিরে আসবার পর বিকেলবেলা পাড়ার অনেক মুক্করী ও মণিবাব্দের আত্মীয়-ম্বজন আসতে লাগলেন তাঁর ভাইদের সান্ধনা দিতে। সকলেই প্রাণ খুলে মণিবাব্র প্রশংসা করতে লাগল। ভাইরেরা বল্লে—বাবা মারা যাবার পরে আমাদের যে কি হ'তো দাদা না থাকলে, তা কল্পনাই করতে পারি না। কত অস্তার করেছি, অত্যাচার করেছি, কিন্তু একদিনের জন্ত দাদার মুখ গন্তীর দেখিনি কিংবা কড়া কথা শুনিনি।

ভাইরেরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে—বৌদি মার। বাবার পর কি রকম বে হ'রে গেলেন—ইদানীং তো বাড়ীর কেউ কথা না বললে তিনি নিজে থেকে কোন কথাই বলতেন না।

মুক্কীরা বল্লেন—ছেলেবেলা থেকে মণি আমাদের সঙ্গে কথনো মুক্ তুলে কথা কয়নি—পাড়ায় এত হালামা হয় কিছ কাকর পক্ষে সেকেনে কোন দিন কথা বলেনি—আজকালকার ছেলেদের মধ্যে এমন নির্বিরোধী চরিত্র কেবা বায় না।

হ'নেনার প্রশংসা বোধ হয় তথনি করা বায়, যথন তার হারা হান্দামার সম্ভাবনা সৃপ্ত হয়ে গিয়েছে।

(होधूवी प्रशाभग्र

বিশ্বস্তরবাব্ ছিলেন পাড়ার ছেনেদের ঠাকুর্দা। তাঁর নাতি সাংটেশ্বর ছিল আমাদের বন্ধ আর সেই সম্পর্কেই পাড়ার ছোটছেলেরা তাঁকে ঠাকুর্দা বলে ডাক্ত। বেঁটে-সেঁটে বেশ বণ্ডা চেহারা, যৌবনে কুন্ডিও জিমক্যাষ্টিক করতেন—বয়স ষাট পেরিয়ে গেলেও শরীরে তথনো অসম্ভব শক্তি ছিল। পাড়ার কোন ছেলেই, এমন কি বড়রা পর্যন্ত তাঁর আঙু ল সোজা করতে পারত না। সব সময়েই গায়ের জায়ের কথা এবং বৌবনকালে তাঁরা গড়ের মাঠে গিয়ে কি রকম গায়ে পড়ে ইংরেজদের সক্ষে বগড়া বাধিয়ে তাদের ঠেঙানি দিতেন, মাসে অস্ততঃ একবার আমাদের কাছে সেই গল্প করতেন। পাড়ার ছোট-বড় সব ছেলেই ছিল তাঁর বন্ধ।

বিশ্বস্তরবাব্র একমাত্র ছেলে অর্থাৎ আমাদের বন্ধু স্থাংটার বাবা যৌবনেই মারা সিয়েছিলেন এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে। তখনও বিশ্বস্তরের মা ছিলেন বেঁচে। মা, স্ত্রী, পূরবধ্, এক নাতি ও এক নাতনী এই নিয়ে ছিল তাঁর সংসার। তখনকার দিনের হিসেবে বিশ্বস্তর বাবু বেশ অবস্থাপন্ধ ব্যক্তি ছিলেন। কলকাতার তিন-চারখানা বাড়ী, তা ছাড়া নিজেদের প্রকাণ্ড বসত বাড়ী ও তার পেছনে আট-দশ বিশ্বের বাগান ও তাতে পূক্রিণী—এই ছিল তাঁর সম্পত্তি। তখনকার দিনে শহরের অনেক বাড়ীর পেছনে বাগান ও পুকুর থাকত। পাড়ার লোকে বল্ত বৃড়ী অর্থাৎ বিশ্বস্তরের মার হাতে না কি নগন্ধ টাকা আছে স্বাধা।

বিশ্বন্তর চৌধুরী প্রার ছেলেবেলা থেকেই লুকিয়ে-চুরিয়ে মাঝে-মাঝে মত্যশান কররেন, কিন্তু একমাত্র পুত্র অর্থাৎ আমাদের স্থাংটেশ্বরের বাবা মারা যাওয়ার গৈ শোক ভদ্রলোক শাদা চোখে আর বরদান্ত করতে পারলেন না। তাই প্রতিদিন প্রভূত পরিমাণে মত্যপান স্থক্ত ক'রে দিলেন।

মভপান ক'রে বিশ্বস্তর বে খুব ছণান্ত হ'রে পড়তেন, তানিয়। কাক্লকে মার-ধোর করা কিংবা রাস্তায় অজ্ঞান হ'রে পড়ে থাকা, এ সব ছিল না বটে কিন্তু চেঁচামেচি হাঁক-ভাক এমন লাগাতেন বে নেহাং যারা তাঁকে জানত তারা ছাড়া আর কেউ তাঁর ত্রিসীমানায় এশুতে সাহস করত না।

সনাতন মাতাল-রীতি অহুসারে চৌধুরী-মহাশরও সকালে আপিসে বেক্ষতেন আর বাড়ী ফিরতেন রাত্রি দ্বিপ্রহরে, এই ছিল তাঁর প্রতিদিনের ইতিহাস। ছুটির দিন ও রবিবারগুলো বাড়ীর বাইরে বেক্ষতেন না বটে তবে সাত-পাড়ার লোক টের পেত বে আঞ্চ চৌধুরীর ছুটির দিন।

রাত ছপুরে বাড়ী ফিরে কড়া-নাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই দরজা পোলা না পেলে চৌধুরী-মহাশয় বড়ই বেজার হতেন। একটা সরু লখ। বছগুলির একেবারে শেষনীমায় ছিল তাঁর বাড়ী। পাছে দরজা খুলতে দেরী হয়, সে জন্ত বিশ্বস্তর গলিতে চুকেই সেই ডাকাতে গলাম হাঁক ছাড়তে শুরু করতেন—গিয়ি, ও গিয়ি—দরজাটা থোলো— আমি এসেছি—

পাড়ার কচি ছেলে-পূলে ককিবে উঠ্ল, আফিংখোরদের নেশা চন্কে গেল—বিশ্বস্তর-গিন্নি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে দরজা খুলে দাড়ালেন।

ক্র্তা বাড়ীতে চুক্টে পাড়া কাঁপিরে গিরিকে সংবাধন করলেন—
বুবেছ গিরি, আন কি হরেছে বানো ?

কাছাকাছি বাড়ীর লোকেরা উৎকর্ণ হ'রে অপেক্ষা করতে লাগল—বিশ্বস্তর আজ কোথায় কি কাগু ক'রে এল শোনবার জন্ত । কিন্তু বিশ্বস্তর-গিন্নির সেদিকে কোনো উৎসাহই নেই । তিনি সাত বছর বয়সে বৌ হ'রে এ-বাড়ীতে চুকেছেন, শুধু বিশ্বস্তরকে নয় তাঁদের তিন পুরুষকে তিনি হাড়ে-হাড়ে চেনেন। নেহাৎ শাশুড়ী এখনো বেঁচে তাই তাঁর প্রতিভার সম্যক্ শুরুণ হ'তে পারে-নি । তিনি বিশ্বস্তরের কথাশুলো গ্রাহ্যের মধ্যেই না এনে নিরুছেগে দরজা বন্ধ ক'রে বাড়ীর ভেতরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। বিশ্বস্তর ছই হাত প্রসারিত ক'রে তাঁর পথ আটকে চীৎকার করতে লাগল—বুঝেছ গিন্নি, আজ বা হয়েছে—

গিন্ধি বলেন—হাা়. হাা, বুঝেছি, এখন ওপরে চল দিকিন— বিশ্বস্তুর ছকার ছাড়লে—কি বুঝেছ! বল কি বুঝেছ?

বিশ্বস্তরের হন্ধার শুনে নাতি-নাতনীদের ঘুম তেঙে গেল। রোজ প্রায় শেষরাত্রে ঠাকুরদাদার সঙ্গে খাওয়া তাদের বাধ্যতামূলক! দাহর সাড়া পেরে তারা ছুটে এল। তাদের দেখে বিশ্বস্তর দ্বিশুণ উৎসাহে স্থক করলেন—জানিদ্ ক্যাণ্টা, আজ কেল্লার পাশ দিরে আস্চি, এমন সময় চার ব্যাটা গোরা সোল্জার—ব্যলি ক্যাণ্টা ইয়া-ইয়া চেহারা ব্যাটাদের। আরে বাবা, আমাকে দেখাচ্ছিদ্ চেহারা! এসেছিল চালাকী করতে—come on fight বলেই এক শালার রগে একটি ঘুরো ঝাড়তেই ব্যাটার চোখটা উপ্ডে একেবারে রান্ডায় পড়ে ঘাচ্ছিল, এমন সময় আর এক ব্যাটা টপ ক'রে চোখটা লুগে নিলে আর ছ-ব্যাটা সেটাকে চ্যাংদোলা ক'রে ধরে কেল্লার মধ্যে ছুটে পালিরে গেল—ব্রাল!

বোঝা-পড়া হ'রে যাবার পর ওপরে ওঠে জামা-টামা ছেড়ে ভিনি স্থান কর্তে গেলেন আর তাঁর গিন্ধি ও পুত্রবর্ মিলে কাঠের উত্তন জালিরে থাবার গরম করতে লাগলেন। স্থান সেরে থেতে বদলে পুচি ভাজা স্থক হবে—ঠাণ্ডা পুচি স্থাবার তাঁর সহু হোতো না কি না!

খাবার সময় সবাইকে সঙ্গে বসতে হবে—সে আশী বছরের মাকে পর্যন্ত। মা খেতেন না, তবে গিন্ধি ও পুত্রবধূকে খেতেই হবে। প্রতিদিন মাংসের বাটিতে খানিকটা মাংস রেখে উঠে ধাবার সময় বলতেন—বৌমা, মাংসটুকু খেয়ে ফেলো।

পুত্রবদূ যে বিধবা, সন্ধোর পর চৌধুরী-মশান্তের সে কথাটুকু আর মনে থাকত না।

একদিন রাত্রি বিপ্রাহর অতীত হয়েছে, এমন সময় কুকুরের কেঁউ-কেঁউ কাল্লার রবে পাড়া কেঁপে উঠল। সলে-সলে চৌধুরী মশায়ের হুলার উঠল কুকুরের চীৎকার ছাপিয়ে—এই বোই (boy) শেক হাও!

সঙ্গে-সঙ্গে আবার কুকুরের আর্দ্তনাদ ও তৎসহ যথোপযুক্ত তিরস্কারের স্থারে চৌধুরীর শাসন ভাষণ —চোপ্রাও ইডিয়ট—বোই, শেক্ ছাও।

বিশ্বস্তরের হুকার-চীৎকার-গান ইত্যাদি প্রায় প্রতি রাত্রেই শুনে শুনে পাড়ার লোকের অভ্যেস হ'রে গিয়েছিল। বরঞ্চ রাত ছুপুরের এই নিয়মিত শাস্তিভঙ্কের ব্যতিক্রম হ'লে লোকে তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শঙ্কিত হ'রে পড়ত! সাড়ে ন-টার ভোপের মতন বিশ্বস্তরের বাড়ী ফেরাটাও সকলে সময় নির্দেশকরূপে ব্যবহার করত। পাড়ার লোকে ব্যস্ত—রাত তথন, চৌধুরী বাড়ী ফেরেনি।

কিছ একটা বিষয়ে চৌধুরীর প্রশংসা করত সবাই যে, দশ-পনেরো মিনিটের বেশী হাঁক-ডাক সে করে না। কিছু সেদিন তাঁর কঠের সলে কুকুর-কঠ বৃদ্ধ হ'য়ে এমন অপ্রায়্য ধ্বনির স্টি হোলো যে সাতটা কনশার্ট পাটি মিলেও তা করতে পারে না।

সে সময়কার লোকদের পরকে সছ করবার শক্তি এথানকার

চাইতে ছিল অনেক বেনী। বিশেষ ক'রে প্রতিবেনীর এই শ্রেনীর অত্যাচার সে যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপেক্ষিতই হোতো। কিন্ধ সে রাত্রে একেবারে অসহ হওয়ার কেউ-কেউ প্রাণের দারে, কেউ বা কৌত্হলের ঠেলার ছুটলেন চৌধুরীর বাড়ীতে—যারা গেল না তারা জেগে বসে রইল ব্যাপারটা কি জানবার অপেক্ষায়।

প্রায় ঘণ্টা-থানেক বাদে লোকেরা চৌধুরী-বাড়ীতে কোলাহলের যে কারণটি জেনে ফিরে এল তা অর্থাক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত। বিবরণটি এই প্রকার—

বিশ্বস্তর চৌধুরী সভেরো-আঠারো বছর বয়সে চাকরীতে চুকেছিলেন, এখন তাঁর ষাট পেরিয়ে গিয়েছে কিন্তু সমানে চাকরী ক'রে যাচ্ছেন। পনেরো টাকার চুকে এখন তিনি আড়াইশো টাকার ওপর মাইনে পান। নিজের বিয়ে, ছেলের বিয়ে, ছেলের মৃত্যুদিন প্রভৃতি কয়েকটি অরণীয় ঘটনা ছাড়া তিনি কখনো আপিস কামাই কয়েন-নি, তার ওপরে কাজের লোক। এই সব কারণে আপিসের কেরাণীকুল ও কর্তৃপক্ষের সকলেই তাঁকে খুবই থাতির কয়তেন। আগেকার সায়েবরা আর নেই, এখন সব নতুন ছোকরা সায়েবরা মেজাজী হ'লেও চৌধুরী মশায়কে সম্মান কয়ত।

ক'দিন থেকে এক ছোকরা মনিবের শুকনে। মুখ দেখে চৌধুরী তাকে বললেন—ক'দিন থেকে আমি লক্ষ্য করছি, কি বেন একটা চিন্তার ভূমি কাতর হ'রে রয়েছে—যদি কোন ছংখ পেরে থাক তো আমি রয়েছি কি করতে? তোমাদের বাপ-দাদারা আমার কাছে কিছু লুকোতেন না। তাঁরা কাছে নেই কিছু আমি তো আছি। আমি দেখা-শুনা করব বলেই তো এই কাঁচা বরুসে তোমাদের পাঠান্ডে সাহস করেছেন তাঁরা এই বিদেশ-বিভূরে।

गाराव कोधुतीत कथा छन रहरन वनल-थक्रवाम कीधुती, खांबारकः

স্থানের ধন্তবাদ। ও কিছুই না। দিন-ছয়েক স্থাপে স্থানার একটা কুকুর মারা গেছে। প্রিয় কুকুর মারা গেলে যে কি ছঃখ মনে লাগে তা কুকুরের স্থ যার নেই সে বুঝতে পারবে না।

চৌধুরী-মশায় সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন—ওঃ, সে তৃঃখের কথা আর বলো না সায়েব। আমার নিজের খুবই কুকুরের সধ কি না
—ও আমি জানি। আমার মা এখনো বলে—বিশে, তোর সমস্ত
সস্তান-মেহ কুকুরগুলোর ওপর পড়ল কি না, তাইতে তোর ছেলেটা
বাঁচল না! বাড়ীতে প্রায় পঞ্চাশটি কুকুর—এক-একটি মরে আর
একখানা ক'রে বুকের হাড় খনে যায় সায়েব। তা ভুমি কিছু তৃঃখ
কোরো না, আমি তোমায় কুকুর এনে দেবো।

বলা বাহুল্য যে, চৌধুরী মশায়ের পুত্রশোকের কারণ সান্নিপাতিক ব্যাধি, কুকুর-প্রীতি নয়। ইতিপূর্বে কুকুরের সধ তাঁর কোন কালেই হয়নি।

চৌধুরীরও কুকুরের সথ আছে শুনে সায়েব একটু শুনী হ'য়েই বললেন—আরে সে কুকুর ভূমি পাবে কোথায় ?

চৌধুরী বললে—সায়েব, তুমি তা হ'লে চৌধুরীকে এখন চেননি।
আমি তোমার ঠিক সেই রকম কুকুরই এনে দোব। উপরম্ভ আমার
কুকুর শেক্ হাও করবে, ত্-পা তুলে দাড়াবে, পেছনের পা তুলে পিকক
হবে, লাকাবে—দেখে বলবে, হাা, চৌধুরী একটা কুকুর দিয়েছে বটে!

সামেব বললে—আমার বরাত থারাপ। রাশিয়া থেকে এক জোড়া 'বোরজোই' কুকুর আনলুম, তার একটা জাহাজেই মরে গেল আর একটা সেদিন গরমে মরে গেল। এথানে ও কুকুর পাও তো দেখো তো—ৰত দাম চার আমি দিতে রাজী আছি।

চৌধুরী বললেন—কুকুর আমি তোমাকে লোবোই, তুমি কিছু তেবো না। কিছ লাম তোমাকে দিতে হবে না। ব্যস! তারপরে চৌধুরীর জার কিছুই মনে নেই। সারেবকে দেখলে মধ্যে-মধ্যে মনে হর বটে, কিছু বর থেকে বেরুলেই ভূলে বান, এমনি চলেছে, এমন সমর সায়েবই এক দিন মুখ ফুটে জিক্সাসা ক'রে কেললে—চৌধুরী, আশা করি, আমার কুকুরের কথা ভোলনি?

চৌধুরী তথুনি বলে ফেললে—সে কথা কি ভুলতে পারি সায়েব!
সেই দিনই বাড়ী গিয়ে আমার যেটা সব চেয়ে ভালো কুকুর, তাকে
বলল্ম—ভোলা, তোর বরাত ভাল রে, আমার সায়েব তোকে চেয়েছে।
যা ব্যাটা, তুই যেমন পেটুক তেমনি জায়গায় যা! ত্-বেলা চপ-কাটলেট
ওড়াবি। ওঃ! আমার কথা শুনে ফুর্তির চোটে ভোলা লাফাতে আরম্ভ
ক'রে দিলে। তারপরে রোজই আপিসে বেরুবার সময় আসতে
চায়—শেষকালে পরশু দিন নিয়ে আসব বলে চেনে বেঁধেছি এমন সময়
ভোলার মন থারাপ হ'য়ে গেল!

চৌধুরীর কথা ভনে সায়েব হাসবে কি কাঁদবে স্থির করতে পারে না, এমন অবস্থা! ভিনি চৌধুরীকে বললেন—বল কি চৌধুরী! ভূমি কুকুরের কথা ব্রতে পার ?

চৌধুরী সবিনয়ে বললে—শুধু কথা নয় ছজুর—মনের কথা! তা বদি না পারলুম তো এত দিন কুকুর পুষলুম কি করতে? তুমি কিছু ভেবো না ছজুর। আজই আসবার সময় ভোলা আসবার জন্ত লাফালাফি স্থক করেছিল। তা আমি তাকে কাল কি পরশু নিয়ে আসব বলে এসেছি।

সায়েবের মুখে বিতীয় বার কুকুরের কথা শুনে চৌধুরী ঠিক ক'রে কেললেন, আর নয়। বার বার আরব্য উপক্রাস শোনালে সে চটে বেভে পারে। বেমন ক'রেই হোক ভাল কুকুর একটা সংগ্রহ করভেই হবে, এমন সংকল্প সারাদিন ধরে আঁটিতে লাগলেন মনের মধ্যে। কোধায় কার কাছে ভাল কুকুর আছে বা সন্ধান পাওয়া বেভে পারে, ভারই আলোড়ন উঠল মনের মধ্যে—কিছুই পান-না, এমন সময়। ভক্তবৎসল দয়া করলেন।

দেদিন রাভ ছুপুরে বাড়ী ফেরবার মুখে একটা চাটের দোকানের সামনে এক পাল কুকুরকে বলে থাকতে দেখে চৌধুরী মশাই স্থির করলেন, সেগুলোর মধ্যে থেকে একটা ভাল দেখে ধরে নিয়ে গিয়ে রাভারাতি শিথিয়ে-পড়িয়ে কাল সকালে সায়েবকে উপহার দেবেন। কিন্তু চিন্তুটিকে কার্য্যে পরিণত কর্বার চেষ্টা-জনিত পরিশ্রমের কলে তাঁর বহু আয়াসলদ্ধ লক্ষ টাকার নেশাটি ছুটে গিয়েছিল এবং সে জন্তু এই মাগার বাজারে কিঞ্ছিৎ বায়-বাহুলাও ঘটেছে।

ব্যাপার কি জানতে চাওয়ায় চৌধুরী মশায় প্রকাশ করেছেন যে বেটাকেই ধরতে গিয়াছেন, সেটাই মেরেছে দৌড় আর সঙ্গে-সঙ্গে তিনিও তার পেছনে ধাওয়া করেছেন। মত্ত অবস্থায় কল্পনার সঙ্গে পদযুগলের তালের সমতা রক্ষা করতে না পেরে ছ-চার বার আছাড়ও থেতে হয়েছে। এই রকম ক'রে তিন-চারটের পেছনে মাইল থানেক ছুটোছুটি ক'রে শেষকালে কুকুরও ধরা পড়ল না, এদিকে নেশাও গেল ছুটে—আবার কেঁচে গণ্ডুস স্থক ক'রে তবে মাথার হতন প্রান এল।

এবারে চোধুরী মশার একটা কাটলেট কিনে কুকুরদের দেখানো মাত্রই সবস্থলো ছুটে এল, কিন্তু এইটে ছিল তাদের সর্দার—এটা আর সবাইকে তাড়িরে নিজে এল অর্থাৎ সমস্ত কাটলেটটি নিজেই থাবে। চৌধুরী মশার তাকে 'আ তু তু' ক'রে থানিকটা দ্রে নিয়ে গিয়ে কাটলেটের আধ্থানা থেতে দিলেন। সারমের-নন্দন থেতে ব্যস্ত, ইতিমধ্যে বাকা আধ্থানা কাটলেট নিজের মুথে পুরে দিয়ে কোঁচাটা খুলে কুকুরটার গলার বেশ ক'রে বেঁধে ফেললেন। তারপরে টানতে-টানতে বাড়ীতে এনে তাকে লাকানো, ছ্-গায়ে দাড়ানো, শেক্ হাণ্ড প্রভৃতি করতে শেণানো হচ্ছিল, এমন সময় পাড়ার লোকেরা গিয়ে উপস্থিত।

পাড়ার সোকেরা এ কথাও বললেন বে, সায়েবী কায়দা- কাছন ও লক্ষ-ঝক্ষণুলো রপ্ত হ'য়ে গেলে শেষরাত্রের দিকে কুকুরটির ল্যান্দ ছাঁটাই হবে এবং সেজন্ত একটু চেঁচামেচিও হ'তে পারে, এমন একটি সংবাদও বিশ্বস্তুর চৌধুরী নাকি তাঁদের কাছে প্রকাশ করেছেন।

এ-হেন স্থাবরটি পেয়ে ত্-একজন শকা প্রকাশ করার তাঁর।
বললেন—ভর নেই, বিশ্বস্তরের মায়ের আওয়াজ পাওয়া গেছে—ব্ড়ীকে
দেখলেই ওর সব মাতলামো ছুটে যাবে। ভাল ছেলের মতন গুটি-গুটি
এখুনি গিয়ে থেতে বস্বে।

সকলে বলাবলি করতে লাগল—বিশ্বস্তর মাকে বড় ভক্তি করে। বে অবস্থাতেই থাক্ না কেন, জীবনে মার কথা সে কথনো অমাক্ত বা অবহেলা করেনি।

বাট বছর বরস হরেছে, অথচ সে ব্যক্তি কথনো মারের কথা অনাক্ত বা অবহেলা করেনি, এমন লোক আর দেখা তো দ্রের কথা
—জীবনে বিতীয়বার শুনিনি।

তব্ও বিশ্বস্তর মাতাল ছিল।

যা হোক, সায়েবের বাড়ীতে কুকুর গেল না বটে কিন্তু সে জীবটি বিশ্বস্তারের বাড়ীতেই রাম গেল এবং মৃত্যু অবধি তার ল্যাজের দৈর্ব্য অকুগ্রই ছিল।

নাতনীর বিরের মাসথানেক পরেই দিন কতক ভূগে একদিন সকালবেলা বিশ্বস্তর চৌধুরীর মা মারা গেলেন। বাট বছর বরসে চৌধুরী-মহাশর মাভ্হীন হ'রে বে খুব আঘাত পেরেছেন, তাঁর মুধ দেশে তা মনে হ'লো না, বরং বেশ খুনী হরেছেন বলেই বোধ হ'লো। আনেকে বলতে লাগলেন—বুড়ীর হাতে বেশ কিছু নগদ ছিল, এত দিন পরে সেগুলি হাতে আসার চৌধুরী আর হাসি চাপতে পারছে না।

বেলা প্রায় পাঁচটার সময় শ্মশান-বন্ধুর দল কিরে এল ছ-টো ভাড়াটে গাড়ী ক'রে। দেখলুম, একটা গাড়ী থেকে বিশ্বস্তরকে প্রায় কোলপাঁজা করে নামিয়ে রান্তার দাঁড় করানো হোলো। সে নিঃশব্দে কাঁদছিল, ভারপরে কয়েক-পা টলে-টলে এগিয়ে এসে ভাদের গলির মুখটার কাছে দড়াম ক'রে পড়ে গিয়ে চীৎকার করতে লাগল—মা গো, আমায় কেলে ভুই কোথায় গেলি!

চৌধুরীর চীৎকার শুনে পাড়ার ছেলে-বুড়ো বেরিয়ে এল। বৃদ্ধ ও চৌধুরী-মশায়ের সমবয়সীরা মিলে তাঁকে সান্ধনা দিতে লাগলেন, ক্ষিত্র কোনো সান্ধানাই তাঁর শোকের আবেগ সামলাতে পারলে না। তিনি সেই রাজার লুটিয়ে 'মা মা' ক'রে কাঁদতে থাকলেন। সেই আকাট যথা চৌধুরীর অন্তঃকরণের একটা জায়গা এমন তুর্বল দেখে কেউ বা তুঃথ প্রকাশ, কেউ বা ঠাটা করতে লাগল বটে, কিন্তু তার সেই কালা বালকদের হৃদয়ে এক জায়গায় এমন ঘা দিলে যে সমবেনায় ভালের চোথ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল।

শেষকালে পাড়ার মুক্রবীরা ভাকে বাড়ীর মধ্যে নিরে যাবার জন্ত ধরাধরি ক'রে দাঁড় করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু কার সাধ্য তাকে সামালার! তার এক-একটা ঝটুকানিতে স্বাই ছিট্কে পড়তে লাগল। তারা স্বাই মিলে আমাদের বন্ধু অর্থাৎ চৌধুরী-মশারের নাজি জাংটাকে বললেন—যা রে জাংটা, ভূই একটু বল্গে যা, ভূই বললে ঠিক উঠে বাবে!

স্বাই বলাবলি করতে লাগল বে, অপরিসীম মাছুশোক নিবারণের অন্ত চৌধুরী অপরিমিত মন্তপান করেছে। একজন বৃদ্ধ, তিনি চৌধুরী-মশারের চাইরে বরসে কিছু বড় ছিলেন! ভদ্রলোক তামাক টানতে-টানতে বলতে লাগলেন—একটু বাদে ও আপনিই উঠে যাবে'ধন—সারা জীবনটা কাট্ল ওর কেলেকারী দেখতে-দেখতে—

যা হোক, চৌধুরী ওঠেই না, কেউ সামলাতেও পারে না, এমন সময় স্থাটো কাছে গিয়ে বললে—দাত্ন, চল ভেতরে, ওরা সব কারাকাটি করছে।

স্থানীর কথাগুলো চৌধুরী-মণায়ের মাতৃশোকায়িতে দ্বভাত্তির কাজ করলে। তিনি দ্বিগুণ জোরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন—ওরে স্থান্টা রে, ওরা কি বুঝবে রে শালা! তোর মা একুশ বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল; তোর তখন চার বছর বয়সে—মামার মা বিধবা হয়েছিল চোদ্দ বছর বয়সে, আমার বয়সে তখন তিন মাস! তো শালার বাপ গেলেও ঠাকুর্দা, ঠাকুরমা পর্যান্ত বেঁচে ছিল - আমার এই ছনিয়ায় এক মা ছাড়া আর কোন শালাই ছিল না রে। সেই মা আমার চলে গছে—আমার ছঃখ তুই শালা কি বুঝবি!

এদিকে ঠাকুর্দার ওই রকম হানন্তা হচ্ছে দেখে বন্ধ স্থাংটেশ্বর নিজেকে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগল। অবশেষে উপারান্তর না দেখে ছেলে-বুড়ো সবাই এক্যোগে মিলে চৌধুরী-মণায়কে ভূলে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেল।

পাড়ার মুরুব্বীরা চৌধুরীর সম্বন্ধে ভবিশ্বধাণী করলেন বে মারের শোক ভিন দিনের, মাঝে থেকে তার মহ্যপানের মাত্রা বেড়ে যাবে।

গণকের ভবিশ্বধাণী বেষন কতক মেলে, কতক মেলে না, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হোলো না। মন্ত্রপান বেড়ে গেল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাতৃশোকও বেড়েই চলল। মায়ের প্রাদ্ধ-শাস্তি হ'য়ে যাবার পর চৌধুরী-মশায় আর আপিসে বেরুলেন না। সেথান থেকে সায়েবরা ডেকে পাঠাতে লাগল, লোক-জন যাওয়া-আসা করতে লাগল, কিন্তু চৌধুরী তাদের বলে দিলেন—আমার যথন সতেরো- আঠারো বছর বয়েস, তথন মা একদিন বলেছিল, ওরে বিশে, একটা কাজ-কর্মে মন না দিলে বয়ে যাবি। শেষকালে আমায় কি পথে বসাবি! এই বেলা একটা চাকরী-বাক্তরী দেখে চুকে পড়। মার কথায় তথন সেই পনেরো টাকা মাইনেতে চাকরীতে চুকেছিলুম। না হ'লে, চাকরী করবার মতন অবস্থা আমার নয়! আজ ও নয়, সেদিনও ছিল না। মা চলে গেছে, আবার চাকরী কিসের।

চৌধুরী বাড়ীতে বসে দিন রাত তেড়ে মগুপান স্থক্ত ক'রে দিলে। বাড়াবাড়ি দেখে ফাংটার ঠাকুরমা অর্থাৎ চৌধুরী-মশারের স্ত্রী এক দিন বললেন—ওগো, একবার আমার মুখের দিকে চাও!

সেইদিনই চৌধুরী-মশায় উকীল, সাক্ষী প্রভৃতি ডেকে এনে উইলের বন্দোবন্ত ক'রে ফেললেন।

কিছু দিনের মধ্যেই অর্থাৎ মায়ের বাৎসরিক হবার আগেই চৌধুরী মশায়েব প্রাদ্ধ হ'য়ে গেল।

বেলো

আর একটি মাতালের কথা বলেই এই প্রসঙ্গ শেষ করব।

আমাদের ছেলেবেলায় বড় রান্তায় অর্থাৎ হ্যারিসন রোডের বোড় থেকে আরম্ভ ক'রে মানিকতলার মোড় অবধি অসংখ্য খোলার বাড়ী, ছিল। এই সব বাড়ীর অনেকগুলিতেই ছিল হোটেল। ডাল, ভাত, মাছের ঝোল, চচ্চড়ির নয়, এখানে চপ, কাটলেট, কারি, কোর্মা ও আরও সব অন্ত্ত নামের মাংসের খাবার তৈরী হোতো। বড় লোকেরা অর্থাৎ বাদের পয়সা, সথ ও সাহস এই তিনই ছিল, তারা মধ্যে-মধ্যে খানা খেতে যেতেন বিলিতি হোটেলে, আর বাদের পয়সা ইত্যাদির অভাব সংস্থেও ছিল রসের প্রাণ, তারা মধ্যে-মধ্যে লুকিয়ে-চুরিয়ে চুকতেন এই সব হোটলে। সে যুগে এ সব হোটেলে খাওয়া একেবারে নিবিদ্ধ না হ'লেও নিন্দনীয় ছিল। তার কারণ এইগুলির মধ্যে নিবিদ্ধ পানীয় ও ভোল্য চলত অবাধে।

আমাদের বাড়ীর পাশেই এই রকম একটা বড় হোটেল ছিল। এই হোটলের মালিক ছিল স্থনামধন্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী। এই রক্ম হোটেল প্রতিষ্ঠা ক'রে জন দেবার পছা দে-ই নাকি প্রথম উদ্ভাবন করেছিল।

একদিন সন্ধ্যার একটু আগে এই গিরিশের দোকানের সামনে খুব ভিড় হয়েছে দেখে নীচে গিয়ে দেখলুম, দোকানের সাম্নের রকে একটা মাতাল এসে বসেছে। তার গায়ে কোনো জামা নেই, পরনের ধৃতিখানা কোনো রকমে কোমরে জড়ানো—খুব মজার মজার কথা কাছে আর লোকেরা হো-হো ক'রে হাস্ছে। ভিড়গুছ লোকের সক্তেই তার ভাব। প্রায় সকলেই তাকে কোন-না-কোনো প্রশ্ন করছে আর সকলকেই সে প্রকটা-না-একটা জ্বাব দিছে এবং প্রত্যকে জ্বাবটাই হাসির ফোয়ারা!

চমক লাগল! ঠিক এ ধরণের মাতাল ইতিপূর্বে দেখিনি।
মাতাল দেখে-দেখে তাদের সহজে একটা আন্দান্ত মনের মধ্যে তৈরি
হ'রে গিরেছিল। একে দেখে মনে হ'ল—এ ব্যক্তি আমার সেই
ক্ষান্তান্তের গণ্ডীর বাইরের লোক।

গোলমাল, হাসি, হর্রা ও ভিড় ক্রমেই বেড়ে উঠছে দেখে হোটেলের স্কালিক চক্রবর্তী মশার শক্ষিত হ'রে বলে ফেললেন—ওরে নেলো, এখন যা ভাই। সন্ধ্যের সময় দোকানের সামনে ভিড় দেখলে থদের ভাকে বাবে।

নেলো বললে—যাচ্ছি ঠাকুর যাচ্ছি। আচ্ছা একটা কথার উত্তর দাপ্ত দিকিন— স্কৃ-স্কৃত্ করে চলে বাচ্ছি। লোক বলে তোমার জ্ঞানগিম্যি আছে। আচ্ছা বল তো বাবা, গাছ আগে কি বীচি আগে? মুরগী আগে না ডিম আগে?

প্রশ্ন ভানেই ভীড়ের সবাই হেসে উঠল। কেউ বললে—গাছ আগে, কেউ বললে—বীচি আগে। কিন্তু সমস্টার সমাধান কেউ করতে পারলে না।

ভীড় বাড়তেই লাগল। দেখলুম, সকলেই তাকে চেনে, ছেলে-বুড়ো সুৰাই তার নাম ধরে ডাকে, সবাই তার সক্ষে কথা কয় আর স্বার কথারই সে ক্বাব দেয় এমন মলা ক'রে যে, না হেসে থাকতে পারা বায় না। প্রথম দর্শনেই মনে হোলো, বাই হোক না কেন লোকটার বুজি স্থাইছে, এ কথা সানতেই হবে।

স্মারও কিছুক্প এই ভাবে হানি-ভাষানায় কাটবার পর চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যবসেন—নেলো, এইবার বা ভাই, দক্ষো মেব, এখন বা । ভোর তো আন্ধ সারারাত চল্বে—রাত্রি' দশটা নাগাদ যদি মনে থাকে তো আসিস, এইথানেই থাবি।

নেলো বললে — ৰাচ্ছি বাবা, ৰাচ্ছি—ৰড্ড ক্লিমে পেরেছে, ছুটো চণ দাও থেয়ে চলে বাই।

— আবার এখন চপ কেন? বলপুম না, রাতে যত চাইবি দেবো।
নেলো বললে—এই তো বাবা বেতালা বাজালে। পেটের মধ্যে
কিনের খেরাল,তান ছাড়ছে হা রাা রাা—তাা রাা রাা—তার সকে
সমানে সকত চালাবে, তা নয় তুমি চিমের ঠেকা হ্রক্ক করলে? কোথায়
এখন বেলা পাঁচটা আর কোথায় রাভির দশটা—কোন পাদাড়ে পড়ে
থাকব তথন, তা মা ধ্যান্তেখরীই জানেন। হুটো চপ দাও, ভাল ছেলের
মতন খেতে-খেতে চলে যাই।

লোক-জন তার কথা শুনে হাসতে লাগল বটে, কিন্তু ঠাকুর মশায় গান্তীর্থ অবলম্বন ক'রেই রইলেন। কিছুক্ষণ বাদে নেলো বললে—আছা, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি, বদি ঠিক উত্তর দিতে পার তো আমি চলে যাব আর যদি না পার তো চারটে চপ খাওয়াতে হবে।

ভীড়ের লোকেরা নেলোর প্রশ্নটা শোনবার জন্ম উদ্বেগ প্রকাশ করতে লাগল। সবাই জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কি প্রশ্ন নেলো?

কিন্ত ঠাঁকুর কিছুতেই খাড় পাতে না। শেষকালে সবাই চাঁদা করে ছ-আনা ভূলে কেললে—তথনকার দিনে এই সব দোকানে ছোট চপের দাম ছিল ছ-পয়সা মাত্র।

নেলো প্রশ্ন করলে—ভগবান আমার কোচুয়ান—কেন বল ভো বাপু ?

क्छे क्वांव मिर्छ भारत ना, नवां**रे हु**भ।

নেলো বললে—কারণ, তিনি আমার বে পথে চালান আমি লেই সেবেই ফলতে বাধা হই।

ভীড়ের লোকেরা হো-হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল। তখুনি চারটে চপ হাজির হোলো। নেলো গণ্ গণ্ ক'রে খেতে লাগল আর লোকেরা ওরি মধ্যে কিছু আমোদ পাবার আশার হাঁ ক'রে সেই দৃষ্ট দেখতে লাগল।

Oxford University Misson বাড়ীটার সদর দরজা আজ্-কাল বিবেকানন্দ রোডের ওপর হয়েছে। আমাদের ছেলেবেলার ও রাজাটার অন্তিওই ছিল না—ও বাড়ীটার সদর দরজা ছিল কর্ণওয়ালিস্ ষ্টাটের ওপরেই, আর ঠিক সামনে বিপরীত ফুটপাতেই ছিল এক মদের দোকান—ঈশ্বরের পাশে শয়তানের বাসা প্রবাদটির জ্বলস্ত নিদর্শনের মতন।

এক দিন বিকেল বেলা, বোধহয় ইস্কুল থেকে বাড়ী ফেরবার মুখে দেখি এই মদের দোকানের সামনে বিপুল জনতা—এত ভীড় যে ট্রাম চলাচল বন্ধ হ'রে গেছে। ভীড় ঠেলে ভেতরে গিরে যা দেখলুম তা কল্পনাতীত। সে দৃশ্য শহরের রাস্তায় কল্পকালে একবার দেখা বায় কি না সন্দেহ!

দেখলুম, মদের দোকানের সামনের চওড়া রোয়াকের ওপরে একটা বিরাট কুমীর পড়ে আছে, অবশু মৃত। তার মুখখানা হাঁ করিয়ে তার মধ্যে ছ-টো এগারো ইঞ্চি থান ইট ভরা হয়েছে। বোড়ায় চড়ায় কায়দায় নেলো তার পিটে চড়ে বসে আছে। তার ছ-পাশে ছোট, বড়, ছুঁচ-মুখো, থ্যাবড়া-মুখো সব মাংস-কাটার ছুরি-ছোরা পড়ে রয়েছে। একটা ছোরা হাতে নিয়ে নেলো ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বলতে লাগল—এত দিন ধরে কত মাহ্র্য খেরেছে তার ঠিক নেই, আজ ব্যাটা ধরা পড়েছে। এর মাংস দিয়ে চপ, কাটলেট, কোগা, কোর্য। বানাব—আপনাদের নেমজন্ম রইল।

নেলোর আসল নাম ছিল লালবিহারী সাহা। সে গালার কাব করত

এবং বেশ ছ-পয়সা রোজগার করত। মাঝে-মাঝে দেখা বেত ধোপদোত ধৃতি, জামা, চাদর ও পায়ে জুতো পরা লালবিহারী বাবু ঘাড় ওঁজে হন্হন্ ক'রে পথ দিয়ে চলেছে। সে সময় অনেককে গুনেছি তাকে সম্ভাষণ
করতে—এই যে লালবিহারী বাবু, কত দুর চলেছেন ?

লালবিংারী ঘাড় তুলে গম্ভীরভাবে উত্তর দিত—এই যাব একটু রাধাবান্ধারে।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, 'লালবিহারী বাবু' মূর্ত্তিতে তাকে মোটেই
মানাত না। তার চেয়ে সেই আধ-ময়লা ধূতি—আধথানা কোন রকমে
কোমরে জড়ানো আর আধথানা রান্ডায় লুটোচ্ছে, এক পা এখানে
পড়েছে আর এক পা ওখানে—সেই অবস্থাটাই যেন তাকে মানাত ভাল।
তার কারণ, ঐ অবস্থায় না পৌছলে তার মুখ দিয়ে তত্তকথা বেরুত না—
যে জন্ম তার এত জনপ্রিয়তা। নইলে সংসারে মাতালের অভাব কি ?

রান্তায় এমন বেলেলাগিরি করা সন্তেও তাকে পুলিশ ধরত না কেন—এটা আমাদের কাছে একটা সমস্তা ছিল। শুনেছিলুম, কলকাতার একজন নামজাদা 'বাবু' মদ থেয়ে রান্তায়-রান্তায় বেলেলাগিরি ক'রে বেড়াবার জন্ত নেলোকে পুলিশের লাইসেন্স ক'রে দিয়েছে। এমন সব দিলদরিয়া মাতাল-বৎসল 'বাবু' বান্তব জগতে বাস না করলেও সেদিন পর্যান্তও তাঁরা লোকের কল্পনা জগৎ থেকে নির্বাসিত হননি।

সে সময় কায়স্থদের পৈতে গ্রহণ নিয়ে শহরে খুব হৈ-চৈ স্থক হয়েছিল। আনেক ধনী ওপণ্ডিত কায়স্থ পৈতে নিতে লাগলেন এবং শাস্ত্র পেড়ে প্রমাণ করতে লাগলেন যে তাঁরা ক্ষত্রিয়। কেউ-কেউ নিজের পদবীর পরে 'বর্মা' শস্কৃতি যোগ করলেন—শহরে খুব হৈ-চৈ, ব্রাহ্মণেরা একেবারে তটস্থ।

এই সময় এক দিন দেখি, অক্সফোর্ড মিশনের সামনে মদের দোকানের রকে একটা একতালা সমান উচু ও সেই অমুপাতে মোটা পিপের ওপর দাড়িয়ে নেলো বক্তৃতা স্থক করেছে—ফুটপাতের ওপরে বেশ ভীড় ৮

দেশের বর্ত্তমান আর্থিক, সামাজিক ও ধর্ম-সম্বন্ধীর অবনতি ও সে বিষয়ে দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সে বলে চলেছে। বিষয়বন্ধ তৃদ্ধাং ও গন্তীর ভলেও তার ভাষার প্রসাদগুণে ইন্ধুলের ছেলে থেকে আরম্ভ ক'রে কলেজের অধ্যাপক পর্যন্ত সকলেই সেই বক্ততা উপভোগ করছে।

বেশ চলছিল, হঠাৎ নেলো বজ্বতা থামিয়ে সেই উচ্চ মঞ্চ থেকে
নামবার চেষ্টা করতে স্থক্ষ করলে। পাছে পড়ে থার সেই ভয়ে কয়েক
জন 'ধর ধর' বলে উঠল, কেউ বা সত্যি তাকে ধরবার জল্প অগ্রসর
হ'লো কিন্তু তারা পোঁচবার আগেই নেলো সেই পিপের মহণ গা বেয়ে
দড়াম ক'রে নীচে পড়েই একেবারে গড়াতে-গড়াতে ভীড়ের কাছে এসে
উপস্থিত হ'লো। ভীড়ের মধ্যে এক ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে এতক্ষণ তার বজ্বতা
উপভোগ করছিলেন। ভদ্রলোকের থালি পা. গায়ে নামাবলী, নেডা
মাথায় মোটা টিকি, এক হাতে একটা পোঁটলা—বোধ হয় য়জমানের
বাড়ী থেকে কিরছিলেন। নেলো কোন রকমে ভূমিশ্যা ছেড়ে টলমল
করতে-করতে ব্রাহ্মণের সামনে এসে অতি বিনীতভাবে নমস্কার ক'রে
বল্লে—ঠাকুর মশায়, প্রণাম হই। বড় স্থসময়ে এসেছেন আপনি.
স্থাপনার সঙ্গে একটা পরামণি চিল।

ভদ্রলোক হেনে জিজ্ঞাসা করলেন—কি পরামর্শ লালু ?

—আজে, বলছিলুম কি—দেশে এই রকম অনাচার বাড়তেই চল্ল. হিন্দুধর্ম তো আর ট'গাকে না। আপনারা একটু নেক-নজর না দিলে তো সব বায়!

ঠাকুর মশার বল্লেন—বোর কলি, কলিকালে এ সব তো হবেই।
নেলো বল্লে—কারস্থরা পৈতে নিতে আরম্ভ করেছে
আনেন কি ? ছ-দিন বাদে অস্ত ভাতেও পৈতে নেবে, দেখে
নেবেন আপনি।

ठीकूत वक रारत वन्त्न-हैं। कानि । अता नव कवित श्राहर

—তা দেশে ক্ষত্রিরের দল এত বাড়তে দেওয়া কি ঠিক হচ্ছে? এর একটা বিহিত করতে পারা যায় না কি?

ঠাকুর মশায় তাঁর পোঁটলাটা ছলিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে বল্লেন—কি আর করা বাবে, এ যুগে ব্রাহ্মণের কথা কি আর কেউ শোনে ?

নেলো টলতে-টলতে ত্-হাত প্রসারিত ক'রে তাঁর পথ আটকে বল্লে—শোনে বই কি, তেমন বামুন হ'লে শুনতেই হবে। আমি বলি, একটা কান্ধ করলে হয় না?

- -- কি কাজ ?
- ক্ষত্রিয়দের ঠাণ্ডা করা আপনাদের মতন চাল-কলা-থেকো বাম্নের ক্ষম নয়। বলছিলুম কি, পরগুরাম ঠাকুরকে একবার থবর দিলে হয় না ? আর একবার এই ভারতভূমিকে নি:ক্ষত্রিয় ক'রে দিয়ে যেতেন।

ঠাকুর মশার আর বাক্যব্যয় না ক'রে বাড়ীমুখো ছুটলেন।

সেময় কায়স্থদের গৈতে নেওয়ার হুজুগে একজন বেশ নাম করেছিলেন। ইনি রোজ সকালে গঙ্গমান ক'রে রেশমের কাপড় পরে বেদপাঠ করতেন। তাঁর সেই বেদপাঠ রান্তা থেকে শুধু যে শোনা যেত তা নয়, তাঁকে দেখতেও পাওয়া যেত। একদিন সকাল বেলা ভদ্রলোক বেদপাঠ শুরু করেছেন, এমন সময় কোথা থেকে নেলো এসে হাজির! তার হাতে একটা খাঁচা আর তার মধ্যে বিরাট আকারের এক মোরগ, সঙ্গে বেশ একটি জনতা, তার মধ্যে বালকের সংখ্যাই বেশী। খাঁচাটাকে মুখের সামনে ধরে নেলো শুর ক'রে চেটাতে আরম্ভ ক'রে দিলে—পড় বেটা রাধাকৃষ্ণশ্রাম—

ছেলের দূল হো-হো ক'রে উঠতেই ভদ্রলোকের বেদপাঠ মাথায় উঠে গেল। মুথ ভূলে ব্যাপার দেখে এগিয়ে এসে তিনি নেলোকে জিল্লাসা করলেন—কি হচ্ছে লালু? — আজে, পাথীটাকে রাধাকেই পড়াচ্ছি।

ভদ্রলোক হেদে বললেন—মুরগীতে কথনো রাধাকেই পড়ে ?

নেলোও হেদে বললে—কেন পড়বে না মশার! আপনার ছারা

বিদ বেদ উচ্চারণ হ'তে পারে তো আমার মুরগী কেন রাধাকেই
বলতে পারবে না ?

আর কথা না বাড়িরে তিনি জানালাটা বন্ধ ক'রে দিলেন।
এই রকম প্রায় দেড় বুগ ধরে ঘরের পরসায় মদ থেছে নেলো
মাতাল রাস্তার লোকদের আমোদের খোরাক জুটিয়ে চলছিল—
কথনও পায়ে হেঁটে, কথনো মুটের মাধায়, কথনও গাড়ীর চালে—হঠাৎ
এক দিন সে চারপায়ায় চড়ে চলে গেল—unmourned, unattended
and unsung.

जमा ख

STATE CENTRAL LIBRARY